প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো. জাহিদুল ইসলাম

সম্পাদক
নাসরীন জাহান লিপি

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্প নির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

যোগাযোগ ও সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৮৫
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd,
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

মূল্য : ২০.০০ টাকা

সম্পাদকীয়

জানো তো, মানুষের চেহারা নিয়ে জন্ম নিলেই কিন্তু মানুষ হওয়া যায় না। মানুষকে মানুষ হয়ে উঠতে হয়। জানো কি, মানুষ কীভাবে হতে হয়?

ভুল করা মানে থেমে থাকা নয়। ভুল করতে করতে ঠিক কাজ করতে শিখে যাওয়াই জীবনের আসল কাজ। এভাবেই জয় ধরা দেয়। জয়ী হতে হলে তাই লড়তে হয়। কীভাবে লড়তে হয়? এর একটাই মন্ত্র- যার যা কিছু আছে, তা নিয়েই লড়তে হয়।

লড়াই থামিয়ে হতাশ হয়ে থাকা বোকার কাজ। ভীতুরাই হতাশ হয়, লড়াই থামিয়ে দেয়। লড়াইয়ের পরিকল্পনা কীভাবে করতে হয়, তা শিখতে হবে। জয়ী হতেই হবে। তুমি যেভাবে জয়ী হতে চাও, ঠিক সেভাবেই জয়ী হবে তুমি।

তোমার জয়ের অনুপ্রেরণা দিতে সাথে আছে নবারুণ। এই সংখ্যা তাই সেজেছে তোমার জন্য লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে। আশা করি, উপকৃত হবে তুমি।

শুভ কামনা রইল তোমার জন্য, তোমাদের জন্য।

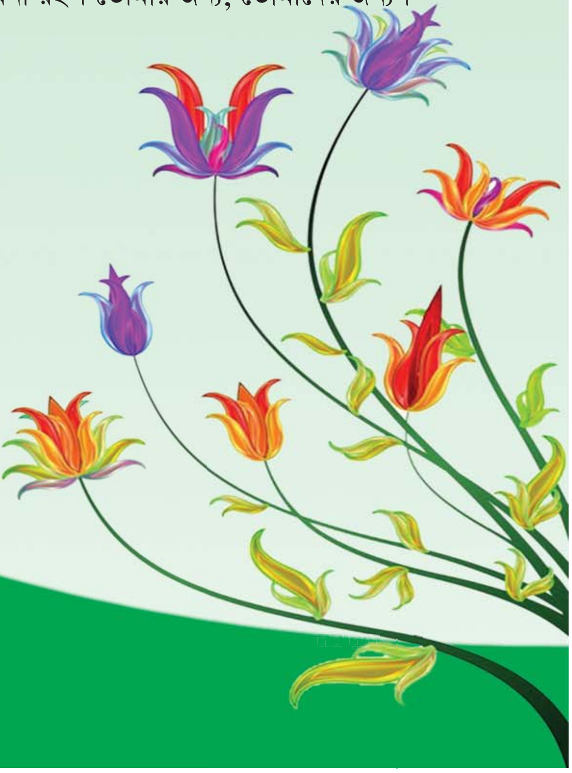

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সূচি

নিবন্ধ

০৬ মানুষের মতো মানুষ হতে হলে কী করবে তুমি/ অজয় দাশগুপ্ত
০৮ ভুল করা মানে থেমে যাওয়া নয়/ খাজা নিজাম উদ্দিন
১০ আত্মহনন: সমস্যা সমাধানের কোনো পথ নয়
ড. মোহাম্মদ হাননান
১৩ লড়তে হবে যার যা কিছু তা নিয়েই/ নাসরীন মুস্তাফা
১৭ ফেল করাও গুরুত্বপূর্ণ/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
১৮ অনুপ্রেরণার উদাহরণ/ শাহানা আফরোজ
২২ ভালো ছাত্র হতে স্মরণশক্তি বাড়াও/ আলম শামস
৩০ সড়কে নিরাপদ থাকো নিরাপদ রাখো/ রেজা উন নবী(রেজান)
৩৯ সাইবার সচেতনতা/ মেজবাউল হক
৪০ রংধনু খাবারের গল্প/ শাহিদা সুলতানা
৪৯ নিজের বাল্যবিবাহ নিজেই ঠেকাচ্ছে/ জান্নাতে রোজী
৫৬ হারিয়ে যাওয়া শিং শিল্প/ মোহাম্মদ আসাদ
৫৭ প্রতিবন্ধীদের কাজের সুবিধা বাড়ছে/ তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৬৩ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

কার্টুন

০৪ বাবার উপদেশ/ সি চিন পিং/ আঁকা: আবু হাসান

পিঁপড়ে বিদ্যা

২৭ আগুনে পিঁপড়ের কথা/ আমির খসরু সেলিম
২৮ লাল পিঁপড়ে/ ফারদিন শামস তিমির
২৯ একতাবদ্ধ এক পিঁপড়ে সমাজ/ এম আতিকুল ইসলাম

গল্প

২৪ মুমুর দল ও ভণ্ড পশুচোর/ হালিমা রীমা
৩২ ভাষা-দাদুর সঙ্গে কাটাকাটি/ তারিক মনজুর
৪৫ নীল দেশে ওরা পাঁচ জন/ মমতাজ বেগম
৫৮ ফুলি/ শারমিন জিকরিয়া
৬১ রাজার ডিমের স্বপ্ন/ সাবরিনা আক্তার

সাক্ষাৎকার

২০ রাফি ধারাভাষ্যকার হতে চায়/ মো. জামাল উদ্দিন

ক্যারিয়ার

৩৪ কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল পড়তে চাও?/ মো. জিয়াউল হক জীম

স্বাস্থ্যকথা

৪২ শিশুদের বাতের ব্যথায় অকুপেশনাল থেরাপি/ রাবেয়া ফেরদৌস

কবিতা

০৩ ফারুক নওয়াজ
১২ শামসুল করীম খোকন
১৯ ব্রত রায়
২১ শফিকুল ইসলাম শফিক
২৩ ম. মীজানুর রহমান/মাহবুব মিয়াজী
৩৮ স্বপন শর্মা/ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান/মৃঈয মুবার্‌রত
৪১ নাসির ফরহাদ
৪৩ নাসিরুদ্দীন তুসী
৪৪ শরীফ আব্দুল হাই/মো. শাবাব হোসেন
৪৮ মেসকাউল জান্নাত বিথি/ সিরাজ সালেহীন
৬১ মোছা. শাম্মী আখতার/ মো. মুশফিক মিদুল

সায়েন্স ফিকশন

৫০ ওয়েলকাম টু মিরর ওয়ার্ল্ড/ আশরাফ পিন্টু

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: মো. রায়ান কামাল/ লামিয়া আক্তার
শেষ প্রচ্ছদ: কাজী নাফিসা তাবাসসুম
০৬ প্রমিথি ত্রিপুরা
০৮ নিহন আনান রহমান
১২ টইটই হিলালি
৪১ ফাহমিদা মীম
৪৪ মুবাশশির আহমেদ কাদির
৬০ আসসিরাতুল বর্ণ
৬২ তাইছির ফারুকী ইসরাক/ তাহমিদ আজমাঈন আহনাফ

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nabarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ-এর আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

রিকশাচালককে আপনি আর ড্রাইভার সাহেব না বললে আব্বা বকা দিত: প্রধানমন্ত্রী

ছোটোবেলা থেকে বাবা আমাদের শিখিয়েছেন রিকশাওয়ালাকে *‘আপনি’* বলতে এবং আমরা আপনিই বলতাম। গাড়ির ড্রাইভারকে *‘ড্রাইভার সাহেব’* বলতে নইলে আব্বার বকা খেতে হতো। ২৩শে জুন বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের মাঝে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে এ কথাগুলো বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরকারের নবীন কর্মকর্তাদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, ‘আমাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা শিক্ষায় সকলকে উৎসাহিত করছি। কিন্তু কোনো কাজ যে ছোটো না, কোনো কাজ যে খাটো না এটা মাথায় রাখতে হবে। কারণ লেখাপড়া শিখলেই যে আমি ধান কাটতে পারব না, এটা ঠিক না।’

বিশ্বের সেরা জাতীয় পতাকার তালিকায় বাংলাদেশের পতাকা

দেশের স্বাধীনতার প্রতীক জাতীয় পতাকা। আমাদের জাতীয় পতাকা শুধু এক টুকরো কাপড় নয়। এতে জড়িয়ে আছে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আত্মত্যাগের বীরত্ব কাহিনি। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বিশ্বের সেরা অর্থবহ পতাকার তালিকা প্রকাশ করেছে। তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে বাংলাদেশের পতাকা। তালিকায় ১০টি দেশের জাতীয় গড়ন ও অর্থের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশগুলোর ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও বীরত্ব। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার সবুজ রং এদেশের প্রকৃতি ও তারুণ্যের প্রতীক। আর সবুজের মাঝে থাকা লাল বৃত্ত উদীয়মান সূর্য, স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদদের রক্তের প্রতীক। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার নকশা ১৯৭২ সালের ১৭ই জানুয়ারি সরকারিভাবে অনুমোদিত হয়।

নবারুণের ঈদ সংখ্যা নিয়ে অসাধারণ ছড়া লিখেছেন দেশের প্রখ্যাত ছড়াকার, নবারুণের প্রিয় লেখক ফারুক নওয়াজ। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। নবারুণ উৎসাহিত হয়েছে। সাথে থাকবেন এভাবে, এই কামনা রইল।

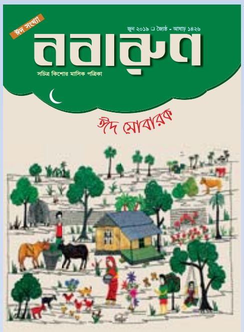

খুকু আপার নকশিকাঁথা

ফারুক নওয়াজ

ঈদ সংখ্যা নবারুণের প্রচ্ছদটা দারুণ ভালো;
খুকু আপার নকশিকাঁথার চিত্ররেখা মন জুড়াল।
চিরকালের বাংলা আমার, চিরকালের প্রাণের ছবি..
জীবনানন্দ, রবি ঠাকুর যার মায়াতে হলেন কবি।
যে ছবিটা জড়িয়ে বুকে কালজয়ী এক কাব্য লিখে..
পল্লিকবি জসীমউদ্দীন জাতির মনে আছেন টিকে।
মাটির উঠোন, দোচালা ঘর, খড়ের পালা ঘরের পাশে..
কিষান বধূর হাতের দানা খাচ্ছে খুটে মুরগি-হাঁসে।
হালের গরু করছে আহার চাষির হাতের আদর পেয়ে..
গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দুলছে সুখে গাঁয়ের মেয়ে।
দূরের মাঠে চরছে ভেড়া, মাঠের শেষে গাছের সারি..
আঁকন-বাঁকন মেঠো পথে দৃশ্য আহা কী বাহারি!
ফুলের বনে লাল-বেগুনি ফুল ফুটেছে থোকা-থোকা..
প্রজাপতির নাচন দেখে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে খোকা।
খুকু আপার নকশিকাঁথা দেখলে প্রাণে আবেগ দোলে..
চিরকালের এমন ছবি হাজার স্মৃতির পাখনা খোলে।
সোনার ভোরে বিহঙ্গেরা দুলিয়ে ডানা যাচ্ছে উড়ে..
এমন ছবি নিত্য ভাসে বাংলাদেশের হৃদয় জুড়ে।
খুকু আপার নকশিকাঁথায় কী মায়াবী দৃশ্য ওহো..
এই ছবিটা ঠিক মাগুরা, খুলনা, যশোর, ঝিনাইদহ!
এই ছবিটাই স্বদেশ আমার শ্যামল-সবুজ স্বপ্নে ঘেরা..
নবারুণের ঈদ সংখ্যার প্রচ্ছদই তাই সবার সেরা..

কার্টুন
ফিচার

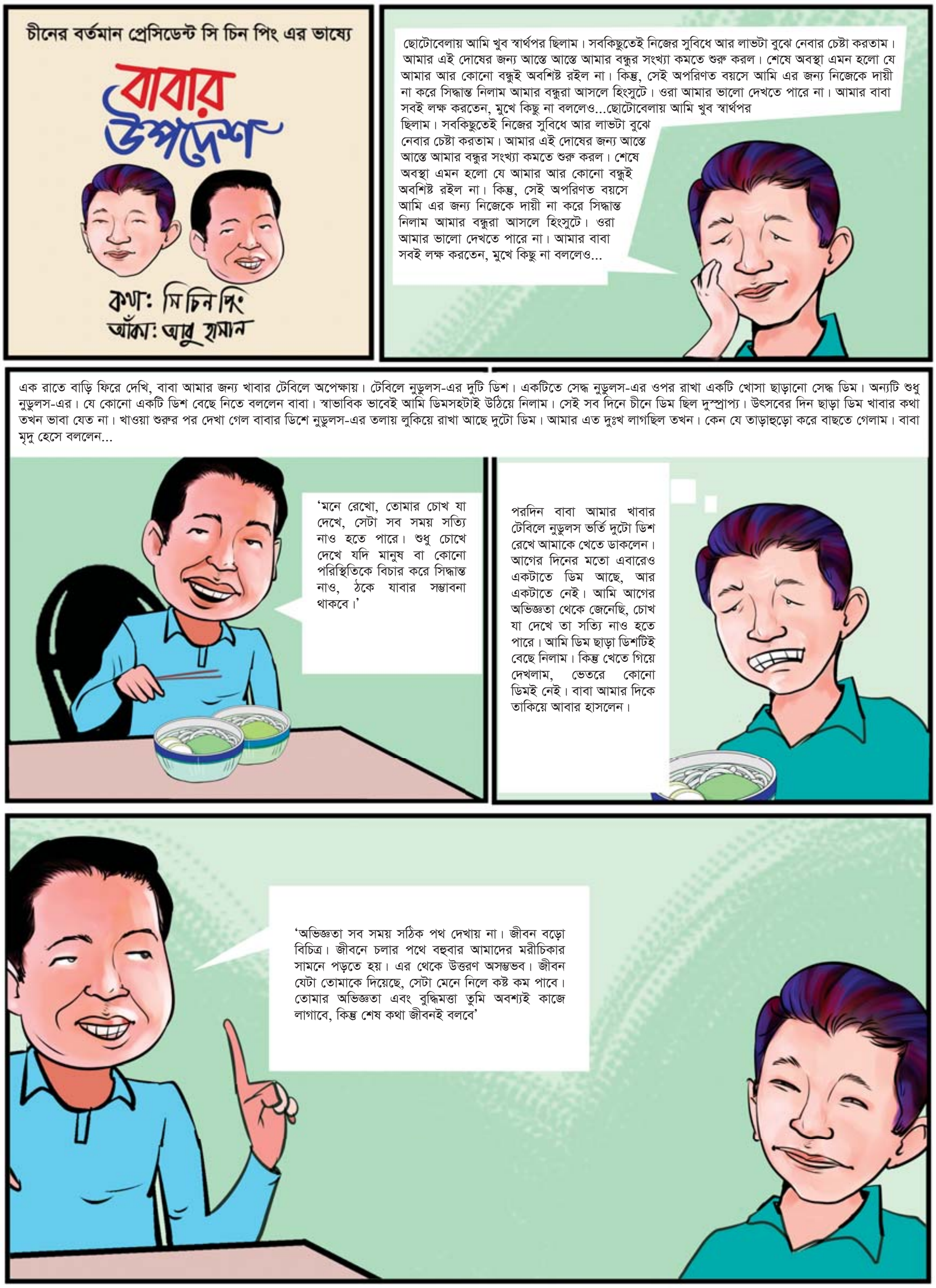

চীনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং এর ভাষ্যে
বাবার উপদেশ
কথা: সি চিন পিং
আঁকা: আবু হাসান
ছোটোবেলায় আমি খুব স্বার্থপর ছিলাম। সবকিছুতেই নিজের সুবিধে আর লাভটা বুঝে নেবার চেষ্টা করতাম। আমার এই দোষের জন্য আস্তে আস্তে আমার বন্ধুর সংখ্যা কমতে শুরু করল। শেষে অবস্থা এমন হলো যে আমার আর কোনো বন্ধুই অবশিষ্ট রইল না। কিন্তু, সেই অপরিণত বয়সে আমি এর জন্য নিজেকে দায়ী না করে সিদ্ধান্ত নিলাম আমার বন্ধুরা আসলে হিংসুটে। ওরা আমার ভালো দেখতে পারে না। আমার বাবা সবই লক্ষ করতেন, মুখে কিছু না বললেও...ছোটোবেলায় আমি খুব স্বার্থপর ছিলাম। সবকিছুতেই নিজের সুবিধে আর লাভটা বুঝে নেবার চেষ্টা করতাম। আমার এই দোষের জন্য আস্তে আস্তে আমার বন্ধুর সংখ্যা কমতে শুরু করল। শেষে অবস্থা এমন হলো যে আমার আর কোনো বন্ধুই অবশিষ্ট রইল না। কিন্তু, সেই অপরিণত বয়সে আমি এর জন্য নিজেকে দায়ী না করে সিদ্ধান্ত নিলাম আমার বন্ধুরা আসলে হিংসুটে। ওরা আমার ভালো দেখতে পারে না। আমার বাবা সবই লক্ষ করতেন, মুখে কিছু না বললেও...
এক রাতে বাড়ি ফিরে দেখি, বাবা আমার জন্য খাবার টেবিলে অপেক্ষায়। টেবিলে নুডুলস-এর দুটি ডিশ। একটিতে সেদ্ধ নুডুলস-এর ওপর রাখা একটি খোসা ছাড়ানো সেদ্ধ ডিম। অন্যটি শুধু নুডুলস-এর। যে কোনো একটি ডিশ বেছে নিতে বললেন বাবা। স্বাভাবিক ভাবেই আমি ডিমসহটাই উঠিয়ে নিলাম। সেই সব দিনে চীনে ডিম ছিল দুস্প্রাপ্য। উৎসবের দিন ছাড়া ডিম খাবার কথা তখন ভাবা যেত না। খাওয়া শুরুর পর দেখা গেল বাবার ডিশে নুডুলস-এর তলায় লুকিয়ে রাখা আছে দুটো ডিম। আমার এত দুঃখ লাগছিল তখন। কেন যে তাড়াহুড়ো করে বাছতে গেলাম। বাবা মৃদু হেসে বললেন...
'মনে রেখো, তোমার চোখ যা দেখে, সেটা সব সময় সত্যি নাও হতে পারে। শুধু চোখে দেখে যদি মানুষ বা কোনো পরিস্থিতিকে বিচার করে সিদ্ধান্ত নাও, ঠকে যাবার সম্ভাবনা থাকবে।'
পরদিন বাবা আমার খাবার টেবিলে নুডুলস ভর্তি দুটো ডিশ রেখে আমাকে খেতে ডাকলেন। আগের দিনের মতো এবারেও একটাতে ডিম আছে, আর একটাতে নেই। আমি আগের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, চোখ যা দেখে তা সত্যি নাও হতে পারে। আমি ডিম ছাড়া ডিশটিই বেছে নিলাম। কিন্তু খেতে গিয়ে দেখলাম, ভেতরে কোনো ডিমই নেই। বাবা আমার দিকে তাকিয়ে আবার হাসলেন।
'অভিজ্ঞতা সব সময় সঠিক পথ দেখায় না। জীবন বড়ো বিচিত্র। জীবনে চলার পথে বহুবার আমাদের মরীচিকার সামনে পড়তে হয়। এর থেকে উত্তরণ অসম্ভব। জীবন যেটা তোমাকে দিয়েছে, সেটা মেনে নিলে কষ্ট কম পাবে। তোমার অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিমত্তা তুমি অবশ্যই কাজে লাগাবে, কিন্তু শেষ কথা জীবনই বলবে'

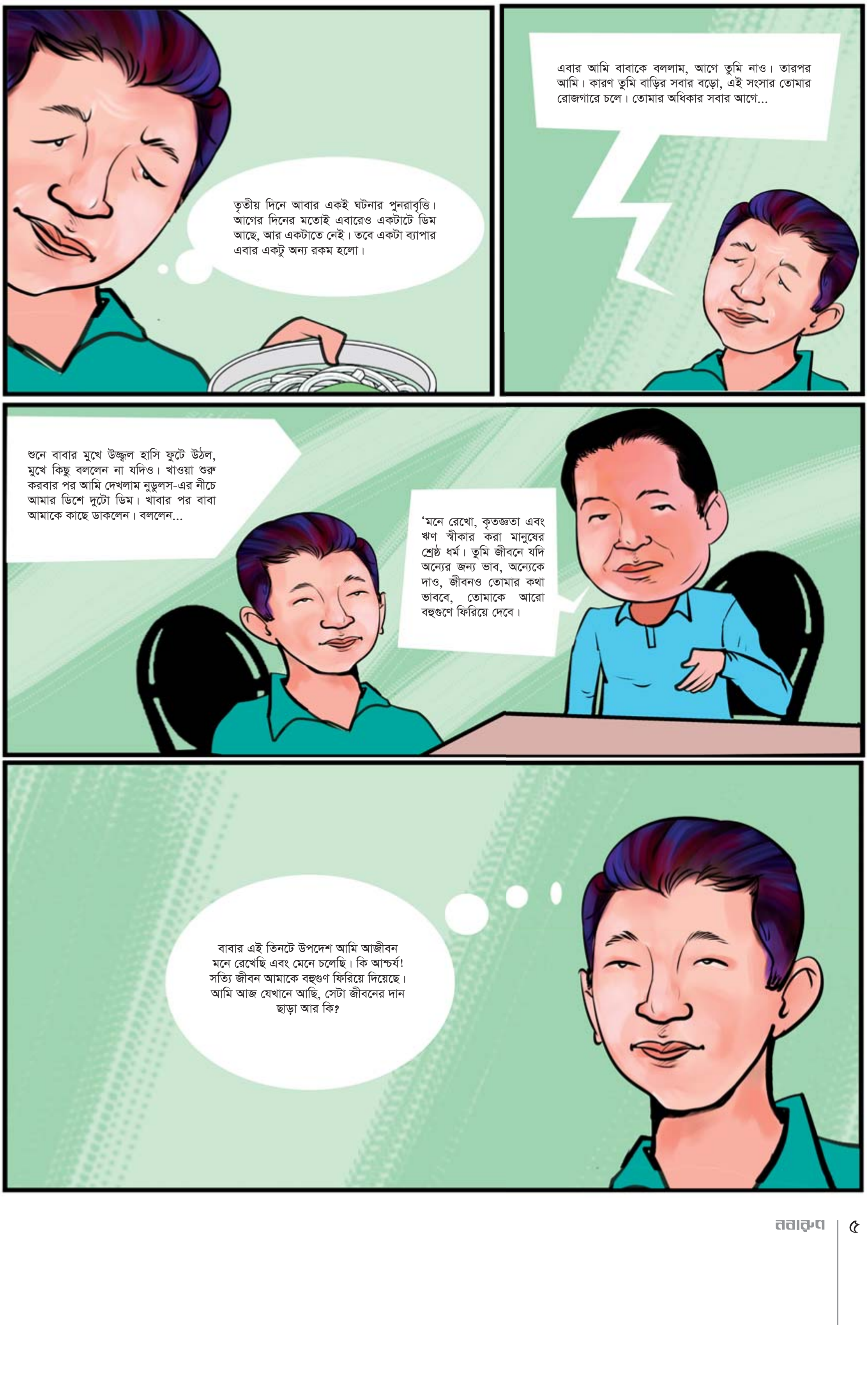
তৃতীয় দিনে আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। আগের দিনের মতোই এবারেও একটাতে ডিম আছে, আর একটাতে নেই। তবে একটা ব্যাপার এবার একটু অন্য রকম হলো।
এবার আমি বাবাকে বললাম, আগে তুমি নাও। তারপর আমি। কারণ তুমি বাড়ির সবার বড়ো, এই সংসার তোমার রোজগারে চলে। তোমার অধিকার সবার আগে...
শুনে বাবার মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠল, মুখে কিছু বললেন না যদিও। খাওয়া শুরু করবার পর আমি দেখলাম নুডুলস-এর নীচে আমার ডিশে দুটো ডিম। খাবার পর বাবা আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন...
'মনে রেখো, কৃতজ্ঞতা এবং ঋণ স্বীকার করা মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তুমি জীবনে যদি অন্যের জন্য ভাব, অন্যেকে দাও, জীবনও তোমার কথা ভাববে, তোমাকে আরো বহুগুণে ফিরিয়ে দেবে।
বাবার এই তিনটে উপদেশ আমি আজীবন মনে রেখেছি এবং মেনে চলেছি। কি আশ্চর্য! সত্যি জীবন আমাকে বহুগুণ ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি আজ যেখানে আছি, সেটা জীবনের দান ছাড়া আর কি?

নিবন্ধ

প্রমিথি ত্রিপুরা, ৩য় শ্রেণি, সেন্ট ট্রিজার স্কুল, রাঙ্গামাটি

মানুষের মতো মানুষ হতে হলে কী করবে তুমি?

অজয় দাশগুপ্ত

আমাদের নতুন প্রজন্মকে আমরা সবসময় বলি মানুষের মতো মানুষ হও। যদি ওরা কখনো জানতে চায়, সে মানুষটা কেমন?

মানুষ হওয়ার জন্য দোয়া-আশীর্বাদের কথা মুখে বললেও নতুন প্রজন্মের কাঁধের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বই-খাতার বোঝা। আমার পরিচিত আত্মীয় বাচ্চাদের কাঁধের ব্যাগ দেখে ভয় পাই আমি। আমি থাকি অস্ট্রেলিয়ার শহর সিডনিতে। দেশে আসলে বা ওখানে কেউ বেড়াতে গেলে শিশু-কিশোরদের সাথে আড্ডা দেওয়া আমার নেশা। তাদের অনেকেই আমার ভালো বন্ধু। আমি দেখেছি তাদের অনেকেই পড়াশোনা করে মনের আনন্দে। তবে বেশির ভাগ পাঠ্যসূচি আর বিষয় তাদের গিলতে হয় ভয়ে। কুইনাইন জাতীয় কিছু কি মানুষ শখে গেলে? না তা ভালোবাসে কেউ?

আমি নিজেও ভুক্তভোগী। বিদেশে এসে ব্যাংকে কাজ করেছি। বিক্রয় ও সেবা উপদেষ্টা থেকে করণিকের কাজ করা কোথাও আমার জীবনে ইলেক্টিভ ম্যাথস নামের জটিল অঙ্কে কোনো কাজে আসেনি। অথচ এ বিষয়ের জন্য প্রচুর মার খেয়ে কলেজে উঠে আমি মানবিক বিভাগ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। বলাবাহুল্য মা আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন বলে এইচএসসিতে আমি বোর্ডেও জায়গা পেয়েছিলাম।

এখন আরেক বিপদ গ্রেড পাওয়ার প্রতিযোগিতা। জিপিএ ফাইভ নামের উল্লাস ধীরে ধীরে দানবে পরিণত হয়ে গেছে। তা না পেলে কেউ কেউ নিজের জান বিসর্জন দিয়ে দেয় বোকার মতো। এ কোন সমাজ নির্মাণ করছি আমরা? যেখানে শিশু-কিশোরদের কোনো মনোজগৎ নেই। এমনিতেই যন্ত্র মানুষের ঘুম সময়, আবেগ কেড়ে নিয়েছে। এক বাচ্চার গল্প আগেও বলেছিলাম,

যে সবাইকে চমকে দিয়ে বলেছিল বড়ো হয়ে মোবাইল হতে চায়। সবাই তার এই কৌতূহলে অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল কেন এই আগ্রহ। শিশু কন্যা তখন নাক ফুলিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমানের সুরে বলেছিল, মা-বাবা দুজনেই তার চাইতে মোবাইলকে বেশি ভালোবাসে, বেশি সময় ধরে বুকে, পকেটে, হাতে রাখে। তাই তার স্বপ্ন মোবাইল হওয়া। এটি ঠাট্টা মনে হলেও বড়ো বেদনার।

বাংলাদেশে মানুষ আগেও মেধাবী ছিল। আমি বলব অনেক বেশি মৌলিক ছিল মানুষের জ্ঞান। আজ যৌগিক আর মিশ্র এসে সব খেয়ে ফেলছে। আসলে নাম্বার পেলে কী হয়? এসো তো আমরা দুনিয়া ঘুরে দেখি কৃতীমানদের অতীত কেমন ছিল?

বিশ্বের প্রতিভাবান মানুষদের তালিকা করলে শীর্ষ পাঁচে থাকবেন আইনস্টাইন। বিশ্ব সেরা এই বিজ্ঞানীর স্কুল তাঁকে রাখতেই চায়নি। তাদের ধারণা ছিল এই বাজে ছাত্রের কাজ লেখাপড়া না করা। এখন যারা ভাবে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে পারলেই জীবন সার্থক, তারা কি জানে কোটি কোটি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পুষতে পারেন বিল গেটস? নিজে ছিলেন ছাত্র হিসেবে পচা। ভালোভাবে পাস করলে হয়ত চাকুরে হতেন, বিশ্বের সেরা ধনী হতেন না। গায়ক এলভিস প্রিসলি কে চেনো? আমি হাওয়াই বেড়াতে গিয়ে তার বাড়ি মানে হলিডে হাউসের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম বেশ কিছু সময়। এত চমৎকার বাড়ি তো প্রেসিডেন্টেরও নেই। প্রিসলি স্কুলের পরীক্ষায় পাস করতে না পেরে স্কুল ছেড়ে পালিয়েছিলেন।

এই যে ফেসবুক-এর জনক মার্ক জুকারবার্গের কপালে বিকল্প কিছু ছিল না। ভাগ্যিস তিনি প্রথাগত পড়াশুনার জাল ভেদ করেছিলেন। তাই তো এমন সামাজিক মিডিয়া দিতে পেরেছেন। অনায়াসে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি দেশ থেকে দেশান্তরে। মানুষ থেকে মানুষে। বেশিরভাগ পরীক্ষায় ভালো করা ছাত্রছাত্রীরা শেষে উচ্চমানের চাকরিজীবী হওয়া ছাড়া কিছুই হতে পারে না।

যাদের লেখা পড়ে বুঝে পরীক্ষায় আমাদের ভালো নাম্বার পেতে হয় সেই রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের স্কুল জীবন বা পরীক্ষা পাস কেমন ছিল? তাঁরা কি লেটার পেতেন না জিপিএ ফাইভ? তাই যারা ফলাফলে ভালো নাম্বার পাও না, তাদের বলি দুঃখ করো না। হতাশ হয়ো না। কাঁদতে চাইলে কাঁদো। কেঁদে হালকা হও। চোখের জলে কষ্ট ধুয়ে নিজেকে বড়ো করার শপথ নাও। খবরদার আত্মঘাতী হয়ো না।

যে মানুষগুলোর কথা বললাম আমরা তাঁদের দলে। তোমরা যারা আজকে আঙুল উঁচিয়ে ভি সাইন দেখাতে পারোনি একদিন তোমার জন্যই সবাই হাত তুলে ভি সাইন দেখাবে। এটাই লক্ষ্য হোক, সত্য হোক। বিশ্বের কোনো সভ্য দেশে বা সমাজে স্কুল আতঙ্কের বিষয় না। বরং আনন্দের বিষয়। আমি এদেশে দেখেছি বাচ্চারা স্কুলে যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করে। কারণ স্কুল তাদের খেলাধুলা ও আনন্দের উৎস। টিচারদের রিভিউ মিটিং হয় এসব দেশে। ছাত্ররা ভালো না করলে দায় নিতে বাধ্য টিচার। বিশ্ববিদ্যালয়েও তাই। ছাত্রছাত্রীরা ভালো না করলে প্রফেসরকে জবাব দিতে হয় কোথায় ছিল তার ব্যর্থতা। এমন প্রক্রিয়া না থাকলে কেবল বাচ্চাদের দোষারোপ করে বলির পাঁঠা বানিয়েই চলবে সমাজ। আমরা কাজে একেবারেই সেকেলে আচরণ করি, তাই না? নাম্বার যদি সবকিছুর নিয়ামক হতো এতদিনে আমাদের সমাজে যারা বেশি বেশি নাম্বার পেয়েছিল তারাই থাকতো মাথার ওপর। এমনটা কি হয়েছে আদৌ? তারপরও অভিভাবকদের মনে বাসা বেঁধে আছে এই জটিলতা।

সে কারণে আমাদের অভিভাবকদের ধারণা বদলানো দরকার। সমাজ এমন অসুস্থ প্রতিযোগিতায় মূলত ক্লীব আর শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। বড়ো মানুষ জন্মাবে না এভাবে। জন্মাবে না স্বপ্ন দেখার মানুষ। শিশু-কিশোর, কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের ওপর চাপ কমানো না গেলে আমরা কিছুতেই বড়ো জাতি, সার্থক জাতি হিসেবে মাথা তুলতে পারব না। মানুষের মতো মানুষের সংজ্ঞা জেনে নেই। সীমানা ঠিক করি। তারপর নতুন প্রজন্মকে এগুতে দেই। মানুষের মতো মানুষ হওয়ার মানে যে মনেপ্রাণে দেশ ও মানুষকে ভালোবেসে বড়ো হবার জন্য সাধনা করা, মুক্তমনের একজন হওয়া। খুলে যাক ওদের মনের আকাশ। তাহলেই তারা পথ খুঁজে পাবে। ■

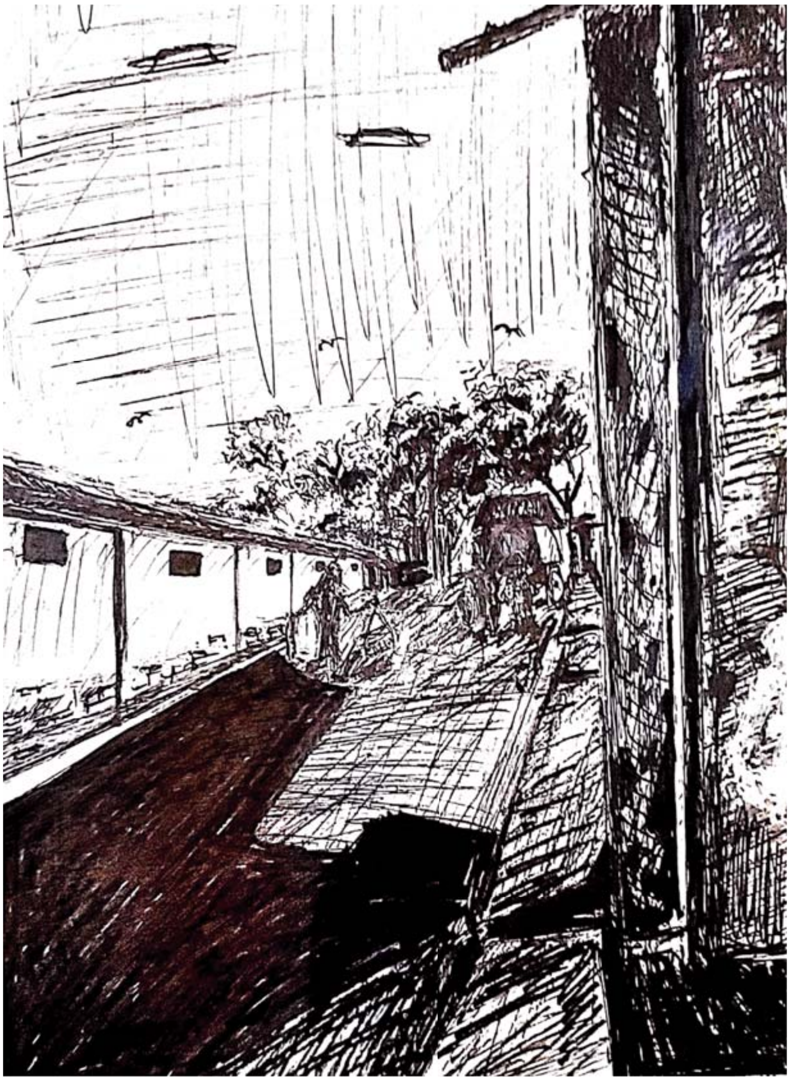

নিহন আনান রহমান, এ লেভেল পরীক্ষার্থী, ব্রিটিশ কাউন্সিল

ভুল করা মানে থেমে যাওয়া নয়

খাজা নিজাম উদ্দিন

ভুল হতেই পারে। সিজিপিএ-টা কম হতে পারে অথবা প্রিয় মানুষটিকে চিনতে ভুল হতে পারে। একটা-দুটো ভুল কি বাকি জীবনের সব চাওয়াপাওয়ার দরজাকে বন্ধ করে দিতে পারে? জীবনের বাকি স্বপ্নগুলো কি মরে যাবে একটা ভুলের জন্য?

পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হতে পারে কিংবা সিজিপিএ-টা হতে পারে খুব সাধারণ। তার মানে এই নয় যে তুমি অসাধারণ হতে পারবে না। এই দুনিয়ার যত সাফল্য সেখানে কি লো সিজিপিএ-রা নেই?

লো সিজিপিএ নিয়ে চিন্তার কিছুই নেই। আবার বলছি চিন্তার কিছুই নেই। হ্যাঁ, ভুল সাবজেক্ট বা ভুল জায়গায় পড়ার কারণে কিংবা তোমার ফাঁকিবাজির কারণেই রেজাল্ট নেমে গেছে। চিন্তার কিছু নেই। বছরগুলো তাই বলে কি জলে গেল? না, জীবনের বড়ো একটা শিক্ষা তুমি আগেই পেয়ে গেছ। তোমার ভুলগুলোকে তুমি সবার আগে জেনে গেছ। ভালো না লাগার বিষয়গুলোতে জীবনকে জড়ানোর শাস্তিটা তুমি আগেই পেয়ে গেলে। অনেকেই সেই শাস্তি পরে পাবে!

শাস্তি যেহেতু আগেই পেলে, তাহলে শুধরানোর সময়টাও আগে পাবে। হ্যাঁ, আরেকটা লড়াই করতে হবে। সে লড়াইটা হলো, নিজের যা ভালো লাগে সেখানে নিজেকে তৈরি করতে হবে। লাগুক আরো কিছু বছর। নিজের মনোবল বাড়াও, নিজের দক্ষতা বাড়াও।

সারা পৃথিবীতে ১ নাম্বার দক্ষতা সিজিপিএ নয়, তার নাম ‘কমিউনিকেশন স্কিলস’ বা যোগাযোগ দক্ষতা। দুনিয়ার সব সাফল্যের মূল রহস্য হলো এই যোগাযোগ দক্ষতা। যোগাযোগ দক্ষতা কী করে? কেন এটি আসলে দুনিয়ার সেরা দক্ষতা?

কারণ এটি তৈরি করে কানেকশনস, বাড়িয়ে দেয় নেটওয়ার্কিং। তোমার কানেকশনস বাড়াও, নেটওয়ার্ক

বাড়াও। তুমি যে কাজে দক্ষ, সেই কাজের জায়গাটা পেতে হলে চাই কানেকশনস, নেটওয়ার্কিং। ভালো চাকরি পেতে হলে, শাইনিং ক্যারিয়ার গড়তে হলে, জীবনে ভালো থাকতে হলে, চমৎকার সব বন্ধু পেতে হলে, বিপদে মানুষের নিশ্চিত সাপোর্ট পেতে হলে, ভালো ব্যাবসা পেতে হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যোগাযোগ দক্ষতার সিজিপিএ!

যার যত কানেকশনস, সে তত সফল। কথা খুব পরিষ্কার। কিন্তু পড়াশুনার চেয়েও অনেক বেশি কঠিন কাজ হলো সেই কানেকশনস তৈরি করা, নেটওয়ার্ক বাড়ানোর দক্ষতা। সবচেয়ে কঠিন কাজ তো আচরণ বদলে ফেলা। আচরণ ভালো না করতে পারলে কোনো কিছুই যতটা ফল দেওয়ার কথা, তার ধারেকাছেও তা দিবে না।

মানুষকে চিনতে ভুল করেছ? তাই বলে দিনের পর দিন পড়ে থাকবে? বিশ্বাস ভঙ্গকারী মানুষটি থেমে নেই। তুমি কেন থেমে থাকবে? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টাকে নষ্ট করো না, পালিয়ে যাওয়া মানুষটিকে ভেবে। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব কিছু স্বপ্ন আছে। নিজের একান্ত কিছু চাওয়াপাওয়ার বিষয় আছে। হয়ত ইচ্ছে করছে একা একা কয়েকটা দেশ ঘুরে আসার। খুব ভালো। কিন্তু তার জন্য তো কিছু অর্জন করতে হবে। ভেবে ভেবে সময় নষ্ট করলে তো হবে না।

কম বয়সে পড়াশুনা কিংবা নানারকমের সম্পর্কের ব্যর্থতা বাকি চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো অধিকার রাখে না।

তোমাকে একটা 'দ্বিতীয় লড়াই' করতে হবে। দ্বিতীয় লড়াইটা আসলে প্রায় সবাইকেই করতে হয়। তুমি শুরু করবে আগে। প্রায়ই শুনি, পড়াশুনা আর ভালো লাগে না! ভালো লাগছে না? রেজাল্ট খারাপ হয়েছে?

ভালো না লাগলে বদলে ফেলো। বদলে ফেলতেই হবে। তোমার জীবনের জন্য অন্য কিছু নির্ধারিত আছে। তোমার শ্রেষ্ঠটা হয়ত অন্য কিছুতে আছে। কোনোরকম মেডিক্যালে বা বুয়েটে বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে হাজার হাজার মানুষ মিডিওকোর বা নিরানন্দ জীবনযাপন করছে। তোমার যা পড়তে ভালো লাগে বা যা হতে ভালো লাগে, তা না পড়লে বা না করলে এমন হবে। তুমি যেটাতে আনন্দ পাও, তোমার সেরাটা দিতে পারো, সেটাতে তুমি ভালো করবেই। ভুল হতে পারে বুয়েটে পড়ে, মেডিক্যালে পড়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, ভুল অনেক কিছুতেই হতে পারে।

কোনো ভুলেরই অধিকার নেই তোমাকে আটকিয়ে রাখার। কোনো ভুলের অধিকার নেই তোমার অসাধারণ ভালো মানুষ হওয়ার জন্য। কোনো ভুলের অধিকার নেই তোমাকে সারাজীবন ঘানি টানার একঘেয়েমি কাজ করানোর। কোনো ভুলের অধিকার নেই এই দুনিয়াতে তোমার শ্রেষ্ঠটা দেওয়ার এবং পাওয়ার বাধা হওয়ার। কোনো ভুলের অধিকার নেই তোমার সেরা স্বপ্নগুলো অপূর্ণ করে রাখার। কোনো ভুলের অধিকার নেই একটা চমৎকার পরিবার পাওয়ার স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত করার। কোনো ভুলের অধিকার নেই এই জীবন থেকে তোমার যা পাওয়ার, তা থেকে বঞ্চিত করার।

কারণ, তুমি এক অনন্য মানুষ, তুমি জানো কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয়।

শুধু জানতে হবে, নিজের শ্রেষ্ঠটা কীভাবে দিতে হয়, সেই দক্ষতা অর্জন করার প্রাণপণ দ্বিতীয় লড়াইটা করতে হবে। প্রথম লড়াইটা (ভুল পড়াশুনা বা ভুল সম্পর্ক বা ভুল সিদ্ধান্ত) ভুল হতে পারে, সেই লড়াই থেকে তুমি জীবনের গভীর উপলব্ধি পেতে পারো সবার আগে।

একটা-দুটো ভুলের কারণে তোমাকে একটা দ্বিতীয় লড়াই করতে হতে পারে। সেই লড়াইতে জয়ী হলে তুমি সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে পারো।

নিজের মতো করে একটা জোস লাইফ লিড করার অধিকার তোমার আছেই। সেই অধিকার তুমি সিজিপিএ আর ভুল মানুষের হাতে দিতে পারো না, সেই অধিকার একান্ত তোমার।

এ জীবন তোমার, জীবনের স্বপ্নগুলো তোমার। নশ্বর এই দুনিয়ার একটা প্রাণবন্ত জোস লাইফ লিড করা তোমার অধিকার এবং তা সম্ভব। ■

নিবন্ধ

আত্মহনন

সমস্যা সমাধানের কোনো পথ নয়

ড. মোহাম্মদ হাননান

মানুষের জীবনে মৃত্যু এমন একটি বিষয় যা সকল মানুষকেই একদিন বরণ করে নিতে হয়। পবিত্র কোরানে মৃত্যু সম্পর্কে অনেক আয়াত রয়েছে। এর মধ্যে একটি উদ্ধৃত করছি : প্রত্যেক প্রাণকেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে। আমি আল্লাহ তোমাদের মন্দ ও ভালো দিয়ে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি। (সুরা আম্বিয়া, আয়াত:(৩৫)। সুরা তওবায় রয়েছে, তিনি (আল্লাহ) জীবন দান করেছেন, তিনিই মৃত্যু ঘটাবেন। (আয়াত:১১৬)।

সুতরাং, মৃত্যু সকল মানুষের জন্য অবশ্যম্ভাবী একটি বিষয়। মৃত্যু জীবন প্রক্রিয়ারই একটি অংশ। মৃত্যুকে তাই আমাদের সকলকেই মেনে নিতে হবে, গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আমি নিজেকে নিজে মেরে ফেলতে পারি না।

আমাদের মধ্যে অনেক আবেগ কাজ করে। কে আছে যে দুঃখ বেদনা ছাড়াই জীবন অতিবাহিত করেছে। কেউ নেই। সাহসের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবিলা করাই প্রকৃত বীরের লক্ষণ। তাই আমাদের ভীরু হলে চলবে না। অন্যের খারাপ আচরণের প্রতিশোধ নিতে আত্মহনন নয়। বরং আত্মহনন হলো নিজেকেই নিজে শাস্তি দেওয়া। অন্যের কারণে আমি নিজেকে নিজে শাস্তি দিতে পারি না। অতএব কাপুরুষ বা কানারীর মতো আমরা পালিয়ে যাব না। সুন্দর এ পৃথিবী আমারও। শেষ নিশ্বাস থাকা পর্যন্ত সুন্দরের জন্য আমার সংগ্রাম।

প্রিয়জন, বাবা-মা এবং অন্যান্য ভালোবাসার মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আত্মহননের পথ নয়। যে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তাকে আমি ভালোবাসা দেবো। যদি ভালোবাসা দিতে না পারি, তাহলে তাকে ঘৃণা করব। পরিস্থিতিটা পালটে দিতে নিজেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করব। জীবনে বড়ো কিছু করে তাদের দেখিয়ে দিতে হবে, দেখো, এই আমি। কিন্তু নিজেকে নিজে হত্যা নয়।

সব সময় মনে রাখতে হবে, এ জীবন আমি আনিনি। আমাকে আমি সৃষ্টি করিনি। আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে জীবন দিয়েছেন। জীবন নিয়ে নেওয়ার অধিকার একমাত্র তারই। আমি যদি আত্মহননের পথ বেছে নেই, তাহলে জীবনদানকারীকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি। এ চ্যালেঞ্জের জবাব তো একদিন তাঁর কাছে আমাকে দিতে হবে, তাই না? তাই আত্মহত্যা নয়।

আমার চিরজীবন ঠিক এমনই থাকবে না। জীবনের উত্থান-পতন আছে। যত বড়ো মানুষদের দেখেছি, যত প্রতিষ্ঠিতদের যাচাই করেছি, সকলের জীবনেই জোয়ারভাটা ছিল। কেউ চিরদিন সুখী হয় না, চিরকাল কেউ দুঃখেও থাকে না। তবে কখনো কখনো জীবন সংগ্রামে অসহায়ত্ব ফুটে উঠে, কষ্টে নিমজ্জিত হয়ে আসে মন, জীবনকে মনে হয় উদ্দেশ্যহীন। এমনটা কখনো কখনো হতেই পারে। কিন্তু এজন্য সাধারণ জীবন থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলব না।

রাগ অতিরিক্ত থাকলে ঝেড়ে ফেলব। দাঁড়ানো অবস্থায় রাগ আসলে বসে পড়ব, বসা অবস্থায় রাগ হলে শুয়ে পড়ব। সবচেয়ে ভালো হয় যদি রাগের সময় ঠান্ডা মাথায় অজু করে নেই অথবা একটা পুরো গোসলই করে নিতে পারি। এর একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আছে।

রাগ হলো আগুনের হলকা। আর আগুন নিভে যায় পানিতে। সুতরাং, রাগের মাথায় কিছু একটা না করে আমরা উপরিউক্ত অনুশীলনগুলো করতে পারি। এতে জিতে যাবে আমাদের সৃজনশীল চিন্তা ও মানবতা।

মানবতা শুধু অন্যের জন্য নয়। মানবিক গুণ ও চিন্তাগুলো কাজে লাগাতে হবে নিজের জন্যও। সাহসগুলো কাজে লাগাতে হবে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্যও। বিষণ্নতায় পেয়ে বসলে অন্যের সঙ্গে মিশব। মিশতে হবে। প্রাণখুলে কথা বলতে হবে আস্থাশীল যে কারো সাথে। তবে আহাম্মকের সঙ্গে কখনো মিশব না। আহাম্মক আমার ভালো করতে চেয়েও ক্ষতি করে

ফেলতে পারে।

দুনিয়ার সবকিছু দেখতে হবে ইতিবাচকভাবে। উপরের দিকে না তাকিয়ে দেখতে হবে নিচের দিকে। কে অনেক উপরে চলে গেছে, তা নিয়ে আমি হতাশ হবো না। বরং আমিও পারি, আমিও পারব-এমন মনোভাব মনের ভেতরে গড়ে তুলতে হবে। আমি দেখব আমিই একা নই, আরো অনেকেই অনেক কিছু করতে পারেনি। আবার অনেকে পেরেছে। আমার চেষ্টাটা হবে, আমি যতখানি পারি, ততটুকুই করার চেষ্টা করব।

মানুষের জীবন একটাই। এ জীবন সে পায় মাত্র একবারই। তাই এমনভাবে বাঁচতে হবে যাতে জীবনে ব্যর্থ হওয়ার গ্লানি আমাকে বইতে না হয়। গ্লানি মুছে ফেলার একটা বড়ো পদ্ধতি হলো, অল্পতেই তুষ্টি। অল্পতে তুষ্টি হলে মানুষের জীবন সুন্দর হয়ে উঠে। তখন সে অনেকের মধ্যে নিজেকে বেশি সুখী দেখতে পায়।

একজন কথা দিয়ে কথা রাখেনি, বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। আমি সে অপদার্থের জন্য স্থান দিতে যাব না। ভাবব, এমন একটা 'কাজে' মানুষের সঙ্গে আমার সব করার কথা ছিল। আল্লাহই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। বরং বেশি বেশি শেয়ার করব।

একটা অপরাধ করে ফেলেছি। মা-বাবা বকা দিয়েছে। পিতামাতা বকা দেবে না তো কে দেবে। তাদেরই তো এ অধিকার। স্বামী স্ত্রীকে গুরুত্ব দিল না। স্ত্রী স্বামীকে ভুল বুঝল। সবই এ সংসারের নিয়মিত ঘটনা। হাজার বছর ধরে এমনটাই হয়ে এসেছে। কেউ একটু বেশি ভুল করেছি, কেউ তুচ্ছ বিষয়কে বড়ো করে তুলছি। এর সমাধান জেদাজেদি নয়, অভিমান করে প্রাণ নিয়ে খেলা নয়। প্রাণ নিয়ে খেলাতে মানুষের অধিকার নেই।

শিক্ষকরা আমাদের অভিভাবক, পিতামাতার মতো। তিনি আমার ভালো চান। আমার খারাপ হলে তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না, আমারই হবে। দিয়েছে একটা বকুনি, একটু বেশিই দিয়েছে, হয়ত এতটা কড়াভাবে না দিলেও পারত। আড়ালে- আবডালেও দিতে পারত। বন্ধুদের সামনে, মা-বাবাকে ডেকে এতটা অপদস্ত না করলেও পারত। বুঝা যায়, শিক্ষক এখানে মানবিক গুণাবলি হারিয়ে ফেলেছেন। এমন অবস্থায়ও আমি মানবিক গুণাবলি হারাবো না। আমি আমার অপরাধের জন্য নিজের কাছেই ক্ষমা চাইব, হায় ! এমনটা করা তো আমারও ঠিক হয়নি। আমি আবার দাঁড়াবো। উন্নত হবে মম শির। আরো ভালো লেখাপড়া, আরো নিষ্ঠা, আরো অসাধারণ হবো। আর এভাবেই হবে আমার প্রতিশোধ নেওয়া। এ বিশ্ব অবাক হয়ে চেয়ে থাকবে আমার দিকে। সবাই বলবে, দেখো ও তো কী বকুনি খেয়েছিল, এখন দেখো, ওর জয় সবদিকে।

আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে :

> সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান।
> সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।
> মুক্ত করো ভয়,
> আপনা- মাঝে শক্তি ধরো,
> নিজেরে করো জয়।

এ গানটি আমি গাইতে শিখব, বলতে শিখব, গানটির অন্তর্নিহিত চলার প্রতি বিশ্বাস রাখব। তাহলে আমার মধ্যে বাসা বেঁধে থাকা জড়তাকে আমি দূর করতে পারব। আমাকে যে উপহাস করছে, আমি তাকে তাহলে করুণা করতে পারব। আমাকে যে নির্যাতন করছে, তাকে আমি উপযুক্ত শিক্ষা দেবো আমার ভালো দিকটি তাকে দিয়ে। যদি সে এতেও না দমে, আমি

কে অনেক উপরে চলে গেছে, তা নিয়ে আমি হতাশ হবো না। বরং আমিও পারি, আমিও পারব-এমন মনোভাব মনের ভেতরে গড়ে তুলতে হবে। আমি দেখব আমিই একা নই, আরো অনেকেই অনেক কিছু করতে পারেনি। আবার অনেকে পেরেছে। আমার চেষ্টাটা হবে, আমি যতখানি পারি, ততটুকুই করার চেষ্টা করব।

তার থেকে দূরে থাকব, কিন্তু আর অধিক চাপ নিতে পারছি না বলে আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে শূন্য করে দেবো না। এতে সে কোনোই দুঃখ পাবে না। তাকে এ অভিমান দেখিয়ে লাভ নেই। তাই আমার সম্ভাবনাকে আমিই নাকচ করে দিতে পারি না। জীবন বড়োই মধুর আবার কখনো কখনো কঠিনও হয়ে উঠে। কঠিনের সময় স্মরণ করব মধুর সময়ের কথা। আমার বিষণ্নতা কেটে যেতে সাহায্য করবে এ স্মৃতি রোমন্থন। বেড়ে উঠা জীবনের প্রতিটি অধ্যায় একটি আলাদা আলাদা জীবন। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য প্রতিটি স্তরেই সুখ-দুঃখের উঠতি বসতি হয়ে থাকে। তাই হতাশ হবো না কোনো অধ্যায়েই। এগিয়ে চলব প্রাণের সততায়। নিজেকে ফুরিয়ে যেতে দেবো না কোনো কালেই। পরাজিত হবো না কোনো সংকটেই। ■

‘ব্যর্থ হওয়া মানে হেরে যাওয়া নয়, ব্যর্থতা নতুন করে আবার শুরু করার প্রেরণা। হাল ছেড়ে দেওয়া মানেই হেরে যাওয়া’

— অ্যানোনিমাস

‘ব্যর্থতার ছাই থেকে সাফল্যের প্রাসাদ গড়ো। হতাশা আর ব্যর্থতা হলো সাফল্যের প্রাসাদের দুই মূল ভিত্তি’

— ডেল কার্নেগী

‘আগুনকে যে ভয় পায় সে আগুনকে ব্যবহার করতে পারে না’

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছবিটি এঁকেছে বন্ধু টইটই হিলালি,
৮ম শ্রেণি, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল

মুখ

শামসুল করীম খোকন

দুই দিকে দুই কান মাঝখানে মুখ
এ মুখের জন্যেই বাড়ে সুখ-দুখ।
এ মুখেই বলা হয় কতশত কথা
কারো কথা শুনে কেউ প্রাণে পায় ব্যথা।
এ মুখেই বলা কথা থাকে না তো ঠিক
ভোটের আগের কথা, পরে যে বোধক।
এই মুখে মিথ্যারই হয় ছড়াছড়ি
এই মুখ দিয়ে হয় কত লেখাপড়ি।
এই মুখে ঝগড়াও করে কতজন
এই মুখে বেঁধে যায় দেশে রণ।
এই মুখে অসহায় দাবি পেতে চায়
এই মুখের খানা চেয়ে কাঁদে অসহায়।
এই মুখে হুমকিতে জাগে হৃদয়ে ভয়
এই মুখে সত্যের কথা আনে জয়
মুখে মুখে কথা বলে এই মুখে কেউ
এ মুখের কথায় ওঠে সংগ্রামে ঢেউ।

লড়তে হবে যার যা কিছু তা নিয়েই

নাসরীন মুস্তাফা

লড়তে হবে। কার সাথে লড়তে হবে? নিজের সাথে। অন্যের সাথে। অন্যায়ের সাথে। সময়ের সাথে। অসময়ের সাথে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লড়েছিলেন, তাঁর সাথে লড়েছিলেন এ দেশের কোটি জনতা, জীবন বাজি রেখেছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা। শক্তিধর পাকিস্তান যে অন্যায় করেছিল আমাদের সাথে, তাঁর প্রতিবাদে তাঁদের লড়াই আমাদের জয়ী করেছিল। আমরা পেয়েছি স্বাধীন একটি দেশ। ক্রিকেট বিশ্বকাপে লড়ছে বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা, নেপথ্যে বেজে ওঠে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত, আকাশে পতপত করে ওড়ে লাল-সবুজ পতাকা। বঙ্গবন্ধুর লড়াই আর আত্মত্যাগ ছাড়া সম্ভব হতো না এসব কিছুই। পাকিস্তান খেলত আর আমরা তাকিয়ে থাকতাম।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লড়াই দেখেছে সারা বিশ্ব। আমরা একজন প্রিয় মানুষের মৃত্যুতেই অঝোরে কাঁদি। আর তিনি হারিয়েছিলেন একসাথে পুরো পরিবার। ছোটো বোনটা ছাড়া তাঁর আর সব প্রিয় মানুষেরা ঘাতকের নির্মম আঘাতে শহিদ হয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের একটি মাত্র রাত তাঁকে নিঃস্ব করে দিয়েছিল। তিনি এবং ছোটো বোন শেখ রেহানা বিদেশে ছিলেন বলে বেঁচে গেলেন। শোক সামলে উঠে শুরু করলেন লড়াই। শেখ রেহানা বিদেশের মাটিতে প্রথম দাবি তুলেছিলেন বঙ্গবন্ধু হত্যার। নিজেরা নিরাপদে ছিলেন না, তবুও ভোলেননি প্রতিবাদের ভাষা। অনেক সংগ্রামের পর শেখ হাসিনা দেশে ফিরতে পেরেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা তখন সামরিক শাসকের হাতে বন্দি। মানুষের সামনে কোনো আশা নেই। তাঁর লড়াই পথ দেখালো। বহু বার তাঁর উপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে। তিনি থামেননি, ভয় পাননি। লড়াকু শেখ হাসিনার বাংলাদেশ আজ বিশ্বের রোল মডেল। তিনি যদি লড়াই না করতেন, আমরা কি এই বাংলাদেশ পেতাম আজ?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম শুনেছ? রাজা রামমোহন রায়ের নাম জানো? তাঁদের সময়টা বড্ড খারাপ ছিল। কন্যাশিশুর বিয়ে হতো বয়স্ক পাত্রের সাথে। স্বামী মারা গেলে চিতায় পুড়িয়ে দেওয়া হতো সেই বাল্যবধূকে। সবাই আনন্দ করে বলত, মেয়েটা সতী হলো। এই

প্রথার নাম ছিল সতীদাহ প্রথা। হিন্দু ধর্মের আবরণে এই বর্বর প্রথাটি সমাজে প্রচলিত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজা রামমোহন লড়েছিলেন। বন্ধ হয়েছিল বর্বরতা। কন্যাশিশু লেখাপড়া করবে, এ কথা ভাবতেই পারত না সমাজ। স্কুলে যাওয়ার সুযোগ না পাওয়া বেগম রোকেয়ার লড়াই বদলে দিয়েছিল সমাজের এই ভাবনাকে। এখন মেয়েরা ছেলেদের সাথে তাল মিলিয়ে লেখাপড়া করছে, নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে। এখন কিন্তু কেউ অবাক হয় না।

এই লড়াকু মানুষদের আমরা স্মরণ করি কেবলমাত্র তাঁদের লড়াইয়ের জন্য। লড়াই না করলে বা লড়াইয়ের মাঠ থেকে চলে গেলে কে মনে রাখে? কেউ না।

তুমি হয়ত ভাবছ, বড়ো মানুষদের বড়ো বড়ো লড়াইয়ের কথা কেন তোমাকে বলছি? বলছি, কেননা, লড়াই তোমারও আছে। তুমিও প্রতিনিয়ত লড়ছ। নিজের পছন্দমতো জীবন গড়ে তুলতে চাইছ। বাবা-মা বুঝতে চাইছেন না, স্কুলে দুষ্টুরা যথেষ্ট বিরক্ত করছে, পথে শিকার হচ্ছো বাজে কথার, গায়ের রং কালো বলে আত্মীয়রাও কেমন করে তাকাচ্ছে, হাতের লেখাটা ভালো হচ্ছে না, নাকের ডগায় ব্রণ উঠেছে, খেলার মাঠে চার-ছক্কা হচ্ছে না, পরীক্ষার ফলাফল ভালো হয় না, গান গাইতে ভালবাসো কিন্তু ডাক্তার হতে হবে বলে হুকুম দেওয়া হয়েছে, কবিতা পাঠিয়েছ নবারুণে অথচ ছাপা হলো না ইত্যাকার নানা ঝামেলা কিন্তু সামলাচ্ছো তুমি এবং তোমরা। মাশরাফি বিন মুর্তজা, আমাদের ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন ফ্যান্টাস্টিক যদি সাত সাতবার পায়ে অপারেশন নিয়ে দেশকে বিশ্বকাপ জেতানোর স্বপ্ন দেখাতে পারেন, তোমার লড়াই কেন থেমে যাবে বলো? লড়াই কে থামায়?

দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ঠিক করবে কীভাবে, ভেবেছ তুমি?

যার সাহস নেই, যার শক্তি নেই, সে-ই পালিয়ে যায় লড়াই থেকে। সে ভীরু। তার জন্য মন খারাপ হতে পারে, একটুআধটু কাঁদতেও পারো, কিন্তু তার পিঠ চাপড়ে দেওয়ার কোনো ইচ্ছে কিন্তু হয় না।

আমি এক চলচ্চিত্র পরিচালকের কথা জানি। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন। মাত্র আট বছর বয়সে মা'কে হারান। কিছুদিন পর বাবাকে। আট ভাইবোন লড়াই করছিলেন দারিদ্র্যের সাথে। কিশোর বয়সে তিনি ভাবলেন, আমি বরঞ্চ মরে যাই। তাহলে ভাইবোনদের খরচ একটু বাঁচবে। তিনি বোকার মতো তা-ই করতে গেলেন, অনেক কষ্টে তাকে বাঁচিয়ে তোলা হলো। আমি শুনে বলেছিলাম, সেদিন যদি মারা যেতেন, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারটা কিন্তু আপনি পেতেন না।

প্রতিবাদী মেয়ে নুসরাতকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে দেখে ভেবো না, প্রতিবাদ করা ঠিক হবে না। সারা বাংলাদেশ ভালোবাসে লড়াকু নুসরাতকে। সারা বাংলাদেশ ঘৃণা করে নুসরাতের হত্যাকারীদের। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে তদারকি করছেন নুসরাত হত্যার বিচার প্রক্রিয়া। এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিচার কাজ শুরু হয়েছে। ১৫ই আগস্টের বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের দালাল -যুদ্ধাপরাধীরা যে বর্বর অত্যাচার করেছিল, তার বিচার হয়েছে, এখনো হচ্ছে। পার পাচ্ছে না কেউ।

হতাশ কণ্ঠে অনেকে বলে, কেউ কেউ পার পায়। কত সময় পার পায়? কেউ একটু বেশি হয়ত-বা। ধরা তাকে পড়তেই হয়। প্রচলিত আইনে যদি ধরা না পড়ে, সৃষ্টিকর্তার আইনে ধরা পড়তে হয়। একটি গল্প বলি শোনো। ট্রেনে ভ্রমণকারী এক লোককে পুলিশ ধরল। তার সিটের পাশে পাওয়া গেছে একটা ট্রাংক, তার ভেতরে ছিল লাশ। লোকটি কিছুই জানত না। পুলিশ তা বিশ্বাস করল না। বিচারে লোকটির ফাঁসির আদেশ হলো। আদালতে দাঁড়িয়ে লোকটি তখন স্বীকার করল, বহু বছর আগে সে একজনকে হত্যা করেছিল। কেউ টের পায়নি। তখন পার পেয়ে যায় সে। কিন্তু পার আসলে পাওয়া যে যায় না, তা সে বুঝল । শাস্তি তাকে ঠিকই পেতে হলো।

লড়াইয়ের মাঠ থেকে চলে গেলে কিন্তু কিছু পাওয়া হয় না। যে চলে যায়, তার পরিবার তার জন্য কাঁদে বটে, তবে সময়ের সাথে সাথে ভুলে যায় সবাই। অরিত্রিকে যদি পেতাম, বলতাম এ কথা। স্কুলের শিক্ষকরা ওর সামনে ওর বাবাকে অপমান করেছিলেন, কেননা ও নাকি পরীক্ষার হলে বেঠিক কিছু করে ফেলেছিল। বাড়ি ফিরে বোকা মেয়েটা গলায় ফাঁস নেয়। আহা অরিত্রি, তুমি তো তোমার বাবার মমতার হাতটা আরো বেশি

মমতা দিয়ে ধরতে পারতে। বলতে, বাবা, একদিন তোমার মুখে আমি হাসি ফোটাবো। এই স্কুলে আমি পড়তে না পারি, পড়ব না। অন্য স্কুলে পড়ব। না হয় নাম না জানা কোনো স্কুলে ভর্তি হব। মন দিয়ে পড়ব। মানুষ হব। নিজের পায়ে দাঁড়াবো। একদিন তুমি আর আমি আবার এই স্কুলে আসব। তুমি তখন সবাইকে বলবে, আমি অরিত্রির বাবা, যাকে আপনারা একদিন অপমান করেছিলেন।

নাফিসও নিজেকে পরাজিত করেছে সেদিন। বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে না বলে ভাবছিল বোকার মতো। ক্লাসের যে মেয়েটার প্রেমে পড়েছিল ও, তার কথা লিখে জানিয়ে বাবাকে শেষ চিঠি দিয়েছিল। প্রেম করছি, আমি খুব খারাপ, তোমার স্বপ্ন পূরণ করতে পারব না। ব্যাস, নাফিস হেরে গেল। জিতে যাওয়ার আর কোনো পথ আছে কিনা, তা পরখ না করেই পালিয়ে গেল। নাফিস কিন্তু ওর বাবাকে খুলে বলতে পারত সমস্যাগুলো। বাবা বকতেন? বাবার বকা শুনলে কী হয়? এমনও তো হতে পারত, নাফিস ওর আবেগকে বুকে ধরে নিজেকে গড়ে তুলত। লেখাপড়া শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাবাকে বলত মেয়েটার কথা। তখন কি বাবা বকতেন? আমার বন্ধু সোহাগ আর মৌসুমি এ রকম করেছিল। ওরা দুজনেই প্রকৌশলী হয়েছিল। তখন দুই পরিবারের কেউই কিন্তু অমত করেনি ওদের বিয়েতে।

ইভটিজিং-এর শিকার হয়ে অভিমানে আত্মহত্যা করার খবর প্রায়ই দেখি পত্রিকাতে। যে অন্যায় করেনি, সে নিজে থেকে নিজেকে কেন শাস্তি দেবে? বলতে পারো, বেচারি বাধ্য হয়েছে। বাসার সবাই বকেছে, তোমার সাথেই কেন এমন হলো? পাড়ার সবাই কেমন করে তাকিয়েছে। ফিসফিস করেছে, ঐ যে মেয়েটা, ও না , ও! স্কুলে যেতে পারছে না। বন্ধুরাও পাশে দাঁড়ায়নি। আমি এ রকম এক মেয়েকে চিনি, যার জীবনে বখাটের ভয়াবহ উৎপাত সহ্য করতে হয়েছিল। মেয়েটা আমাকে বলেছিল, দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে গেছি। সব কথা এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বের করে দিয়েছি। নিজেকে বুঝিয়েছি, আমাকে আমার পায়ে দাঁড়াতে হবে। ও স্কুলে যেতে পারেনি। প্রাইভেটে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। এরপরও উৎপাত বেড়ে গেল বলে '৯৯৯'-এ ফোন করে অভিযোগ করেছিল নিজেই। পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছিল। এরপর ওকে আর থামতে হয়নি।

তুমি বলবে, এ রকম করে কত কথাই তো বলা যায়। লড়াই আসলে খুব কঠিন। জন্ম থেকে দুই হাত আর এক পা নেই যে তামান্নার, তার লড়াই কি কঠিন ছিল না? জিপিএ ফাইভ পেয়েছে মেয়েটা কি কষ্ট না করেই? দিনমজুরের কাজ করে রুবেল পড়ালেখা চালিয়ে গেছে। ও এখন ডাক্তার। কষ্ট না করেই কি পেরেছে? নবারুণ পত্রিকায় ছবি আঁকেন নাহ্‌রীন। কথা বলতে পারেন না। অসাধারণ ছবি এঁকে তোমাদের মন ভরান। নবারুণে লিখছেন জান্নাতুল ফেরদৌস আইভি। রান্নাঘরে আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছিলেন ভয়ানকভাবে। বহুবার অপারেশন হয়েছে, অনেক রকমের শারীরিক সমস্যা নিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন লেখক, চলচ্চিত্র পরিচালক। এ বছর সরকারি অনুদানে তোমাদের জন্য চলচ্চিত্র বানাচ্ছেন তিনি। খুব কি সহজে হয়েছে এসব? সহজে সাফল্য আসে না বন্ধু। কষ্ট করতেই হয়। লড়তে হয়। সেই যে জাতির পিতা ৭ই মার্চের ভাষণে বলেছিলেন, যার যা কিছু আছে তা নিয়ে লড়তে হবে।' আসলেই তাই। জীবনের লড়াইয়ে তোমার কী নেই, তা নিয়ে ভেবো না। তোমার কী কী আছে, আজই সেসবের তালিকা করে ফেলো। কেননা, তোমার যা আছে, তা নিয়েই তোমাকে লড়তে হবে। তবেই না আসবে সফল হওয়ার প্রশ্ন। যদি সফল হও, তবে তো জিতে গেলে তুমি। আর যদি সফল না হও, পরিকল্পনা বদলে নিয়ে আবার শুরু করো লড়াই। যুদ্ধের ময়দানে লড়াইয়ের ছক কখনো কখনো বদলাতে হয় কিন্তু।

সফল যদি হতে চাও, তবে জীবনে সাফল্য পেতে হবে, তাই না? সেই সাফল্য পেতে হলে সঠিক পথে চলতে হবে কিন্তু। কোন পথটা সঠিক, বুঝতে হবে। কোথায় চলেছ, জানতে হবে। তোমার জীবনের গোলপোস্টটা কোথায়, তা যদি না জানো, গোল করবে কীভাবে? গোলপোস্ট জেনে নাও, বলটাকে ঠিক পথে ঠিকঠাক কিক্ মেরে জালে পাঠিয়ে দিলেই না তুমি হবে গোলদাতা। ভুল করলে বল চলে যাবে গোলপোস্টের উপর দিয়ে সীমানার বাইরে----এ---এ! যাবে বল, তবে গোল তো হবে না।

আর সত্যিই তুমি কোথায় রওনা করেছ, ঠিকভাবে বলে কিক্ দিতে পারছ কি না, জানতে চাইলে ঝটপট

জবাব দাও মাত্র পাঁচটি প্রশ্নের। কেন জবাব দেবে প্রশ্নের? এই প্রশ্ন আর জবাবগুলো তোমাকে সাহায্য করবে জীবনটাকে পরিকল্পনা করে গুছিয়ে নিতে। ছুটিতে মামাবাড়ি বেড়াতে যাওয়ার আগে পরিকল্পনা করো। জীবনে সফল হওয়ার জন্য পরিকল্পনা করবে না, তা কি হয়?

বলে রাখি, গোল দেওয়া মানে জীবনের লক্ষ্য অর্জন করা। বিষয়টা খুব ইতিবাচক, তাই না? সব সফল ব্যক্তিরই নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। নেতা বলো, অভিনেতা বলো, অফিসের বস্ বলো, লক্ষ্য থাকতেই হবে। তোমারও থাকা উচিত। কার্যকর বা যুতসই লক্ষ্য থাকা মানে সফল হওয়ার কাজটা অনেকখানি হয়ে যাওয়া। কেননা, লক্ষ্যই তো তোমাকে নিয়ে যাবে লক্ষ্যে।

ভাবছ, আমি তো ছোটো মানুষ। এখনি জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে ফেলতে পারব কীভাবে? শোনো, তুমি যখন বড়ো হবে, কোথাও যদি বেড়াতে যেতে চাও, প্লেনের বা ট্রেনের বা বাসের টিকিট তো কিনবে। সত্যি সত্যিই বেড়ানোর জায়গায় যাওয়ার আগে টিকিট কিন্তু কিনে ফেলেছ। ছোটো বয়সে লক্ষ্য ঠিক করছ মানে, টিকিট কিনে ফেলছ। সত্যিকারভাবে ঠিকঠাক জায়গায় যাওয়া পরের কথা। আগে টিকিট তো কাটো। পরে না হয় অবস্থা বুঝে নানা শহরে নেমে পড়ো, প্লেন বদলে ফেলো। তোমার ফ্লাইটও তো বাতিল হয়ে যেতে পারে। প্লেনে ওঠার পর দেখলে পাশের সিটে বসা সহযাত্রী পছন্দ হচ্ছে না, তখন সিটও বদলে ফেলতে হতে পারে। যেতেই হবে লক্ষ্যে, এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যা করার দরকার তখন তুমি ঠিকই করবে। কেননা, টিকিট তো তুমি কেটে ফেলেছ। টিকিট আছে বলেই যাওয়ার তাড়া আছে। না গেলে টিকিট নষ্ট হবে, তা কি তুমি হতে দেবে সহজে? বুঝতে পারছ, টিকিটখানা তোমার মনে লক্ষ্য অর্জনের জেদ কীভাবে তৈরি করে দেয়? কাজেই, দেরি না করে টিকিট কেটে ফেলো এক্ষুণি।

লক্ষ্য মোটামুটিভাবে দুই প্রকারের হতে পারে। অল্প সময়ের মধ্যে হাতের মুঠোয় আসে কোনো কোনো লক্ষ্য। আর কোনো কোনো লক্ষ্যকে পেতে হলে দীর্ঘকাল সাধনা করতে হয়। কখনো কখনো তোমার প্লেন ভোঁ করে তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় দেশ-বিদেশ। কখনো কখনো বাড়ির পাশের মুদি দোকানের কোনায় পায়চারি করো তুমি। দেশ-বিদেশে উড়ে যাওয়ার মতো বড়ো ভ্রমণ মানেই তো দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জন। যখন কোথাও পৌঁছে গেলে, তখন বদলে গেল চারপাশের সব, তুমি যা দেখছ তা নতুন কিছু, যা শুনছ তা আগে কখনো শোনোনি। এই লক্ষ্য অর্জিত হওয়ায় তুমি যে শক্তি পেলে, তাতে তুমি আরো বেশি শক্তিশালী মানুষে পরিণত হলে। তুমি আরো বুদ্ধিমান। তুমি আগের চেয়ে বেশি দক্ষতা দেখাতে পারো।

দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ঠিক করবে কীভাবে, ভেবেছ তুমি? না ভেবে থাকলে ঝটপট তোমার নোটবইটা টেনে নাও। কলম দিয়ে সেখানে এই পাঁচটি প্রশ্ন লিখে ফেলো:

১. আমি কী করতে চাই?
২. আমি কী হতে চাই?
৩. আমি কী দেখতে চাই?
৪. আমি কী পেতে চাই?
৫. আমি কোথায় যেতে চাই?

প্রতিটি প্রশ্নের নিচে বেশ কয়েকটা (তিন থেকে ছয়টি) দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য লেখো, যেগুলো সম্ভব হতে পারে। একেবারে চিন্তামুক্ত থাকো। হলে হবে, না হলে নাই টাইপের। মনকে ছেড়ে দাও, ইচ্ছেমতো ভাবতে বসুক। তবে লেখাটা হতে হবে ঝটপট, বেশিক্ষণ ভাবা ঠিক হবে না। বুঝিয়ে বলি। প্রথম প্রশ্নটার উত্তরে তুমি হয়ত ভাবছ, আমি আমার পরিবারের ইতিহাস লিখতে চাই। তাহলে স্রেফ এইটুকু লেখো- 'পারিবারিক ইতিহাস'। পৃথিবী ঘুরে দেখতে চাও, এই চাওয়াটাও আছে। লিখে ফেলো 'বিশ্বভ্রমণ'।

এভাবে যত লিখবে, দেখবে মনের ভেতর অনুপ্রেরণার পাখি কীরকম ডানা ঝাঁপটাতে শুরু করেছে। তোমার মনের ভেতর এ্যাতো ইচ্ছে লুকিয়ে ছিল, তা কী তুমি জানতে? এই যে গোপনে থাকা ইচ্ছেগুলো তুমি লিখে ফেললে, তাতে কিন্তু তোমার সচেতনতার ভেতর এগুলোর জায়গা হয়ে গেল। সচেতন না হলে তো চেষ্টা করা হয় না। তুমি এখন সচেতন। কাজেই, তুমি এখন চেষ্টা করবে। টিকিট তুমি কেটে ফেলেছ, এবার ঘুরতে যাবে। এই কৌশলের সবচেয়ে ভালো দিক এটাই।

লেখার পর তোমার এই দীর্ঘমেয়াদি তালিকার দিকে তাকাও, পড় জোরে জোরে। এরপর প্রতিটি চাওয়ার পাশে কোন কোন বছরে তুমি কাজটা করে ফেলবে

বলে বিশ্বাস করছ, তা লিখে ফেলো। এক বছর, তিন বছর, পাঁচ বছর আর দশ বছর- এই চারটি সময়সীমার মাঝে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য পেয়ে গেছ। পারিবারিক ইতিহাস লিখতে দশ বছর লেগে যেতে পারে। কিন্তু এরও আগে, পাঁচ বছরের ভেতরেই তুমি হয়ত সাইকেলে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে যেতে পারো। সে হয়, হোক। মোটকথা হচ্ছে, প্রতিটি লক্ষ্যের সময়সীমা তুমি নিজেই বেঁধে দেবে। এতে আগামী বছরগুলোতে তুমি নিজেকে কোথায় দেখতে চাও, সে ছবিটাও পেয়ে গেলে। এই ছবি অর্জন করতে হলে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের পাশে স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্যগুলোও ঠিক করে দাও। এরা তোমার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে।

এবার ভেবে দেখো তো, তোমার জন্য কোন কোন লক্ষ্য সত্যিই জরুরি? আর কোন কোন লক্ষ্য স্রেফ মজা দেবে? প্রতিটি লক্ষ্য তোমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়েছে। ফাইনালে গিয়ে অঙ্ক পরীক্ষায় একশ'তে একশ পেয়ে গেছ, কেননা প্রতিটি ক্লাস পরীক্ষায় এবং ফাইনালে প্রতিটি অঙ্কের উত্তর তুমি পেরেছ, প্রতিটি অঙ্ক তোমার চেনা। এর জন্য পড়ার টেবিলে তুমি নিজেকে দেখবে, বন্ধুদের সাথে দল বেঁধে পড়তে দেখবে, অঙ্কে স্যারের কাছে বারবার নিজেকে যেতে দেখবে। এই যে, নিজেকে তুমি যা যা করতে দেখলে, তা এক এক করে লিখে ফেলো। এগুলোই তোমার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনের উপায়।

কোনো লক্ষ্যই গুরুত্বপূর্ণ হয় না, যদি না একে পাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ থাকে। কেন তুমি অঙ্কে একশ পেতে চাও? প্রতিটি লক্ষ্যের পাশেই কেন তুমি একে পেতে চাইছ, তার কারণ লিখে ফেলো। যত উদ্ভট কারণই থাকুক না কেন, তুমি তাকে দেখে নাও।

এবার এই নোটবইটি সযত্নে রাখো। মাঝে মাঝে এর পাতা খুলে দেখে নাও, কী কী চেয়েছিলো তুমি। কথামতো সময়সীমার ভেতর তুমি তোমার কাজগুলো শেষ করতে পারছ কিনা, নিজেই যাচাই করো। অর্থাৎ বিদেশ যাত্রার টিকিটটি মাঝে মাঝে দেখো, প্লেনের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে কি না, পরখ করে দেখতে হবে না? আর কেউ না হোক, ঠিক সময়ে প্লেনে উঠতে পারবে তো তুমিই। প্রিয় লড়াকু বন্ধু, তোমার জন্য প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করছি। তোমার যা কিছু আছে, তা নিয়ে তুমি চালিয়ে যাও তোমার লড়াই। জয় তোমার হবেই। হতে হবেই। জয়ী বাংলাদেশের সন্তান যে তুমি। ■

ফেল করাও গুরুত্বপূর্ণ!

সাদিয়া ইফ্ফাত আঁখি

স্যার রিচার্ড জন রবার্টস কে তোমরা কি জানো? তিনি হলেন যুক্তরাষ্ট্রের নোবেল বিজয়ী বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। ১৯৯৩ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর জন্ম ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৩। তিনি ৬ই মার্চ ২০১৯ ঢাকার নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২তম সমাবর্তনে অংশগ্রহণ করেন। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে সুন্দর সুন্দর বক্তব্য তুলে ধরেন। তার কিছু অংশ তোমাদের জন্য তুলে ধরলাম।

- জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসফলতা বা ফেল করাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি তোমাকে সফলতার সোপানে পৌঁছে দেবে। ব্যর্থ হলেই সফলতা অনেক কাছে চলে আসে। আমার ফেলের অর্জন নোবেল বিজয়ী হতে সহায়তা করেছে।
- শিক্ষার্থীরা মেধাবী উল্লেখ করে বলেন, আমি অনেক বাংলাদেশের শিক্ষার্থীর সঙ্গে কাজ করে দেখেছি তারা অনেক মেধাবী। অনেক বড়ো বড়ো সমস্যাও তারা সমাধান করতে পারে।
- পদার্থ বিজ্ঞানের ওপর আগ্রহ ছিল। এ বিষয়ে আমি অনেক লেখাপড়া করেছি। সমস্যা চিহ্নিত করেছি। এর সমাধান করতে গিয়ে বরাবর ব্যর্থ হয়েও আমি হতাশ হইনি। অবশেষে আমি সফল হয়েছি। এর অর্জন নোবেল জয় করতে সহায়তা করেছে।

বন্ধুরা, আমাদের মনে রাখতে হবে ফেল বা অকৃতকার্য হওয়া মানেই ব্যর্থতা নয়। একবার কোনো কাজে অকৃতকার্য হওয়া মানে অনেকগুলো সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাওয়া। সুতরাং, অকৃতকার্য হওয়ার পর নতুন উদ্যেমে তা আবার শুরু করাটাই জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ■

নিবন্ধ

অনুপ্রেরণার উদাহরণ

শাহানা আফরোজ

আমরা করব জয়/আমরা করব জয় একদিন
বুকের ভিতরে আছে প্রত্যয়...

প্রত্যেয় নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের কারো চলার পথই বন্ধুর না। কোথাও উঁচু কোথাও নিচু। উঁচু-নিচু পথ পার করেই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। মনে রাখতে হবে সাফল্যে অর্জন করতে হলে অনেক কষ্ট করতে হবে। একবার ব্যর্থ হলে বার বার চেষ্টা করতে হয়। চেষ্টা করলে সাফল্যে আসবেই। অনেক সময় চারপাশের পরিবেশ আমাদের পক্ষে থাকে না তবুও এগিয়ে যেতে হবে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাও যেন আমাদের থামিয়ে দিতে না পারে। হয়ত অনেক সময় শতভাগ সফল আমরা হব না। তবুও লড়তে হবে।

আমাদের আশপাশে তাকালেই দেখি অনেক সফল মানুষ যারা জীবনে অনেক কষ্ট করেছে কিন্তু আমরা শুধু তাদের সাফল্য আর জীবনের গল্প শুনি। আবার অনেক মানুষের লড়াই-এর গল্প আমরা জানিও না। এমন কিছু লড়াই-এর কাহিনি জানাব আজ তোমাদের।

প্রথমেই বলি বিল গেটস এর কথা যে শিক্ষা জীবনের পরীক্ষায় বেশিরভাগ সময়ই অকৃতকার্য হতো। তাই বলে থেমে যায়নি। তার বার বার চেষ্টা আজ তাকে মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা করেছে।

আমাদের ক্যাপটেন মাশরাফি বিন মর্তুজা সাতবার পা অপারেশন করেছে তাই বলে কি থেমে আছে তার খেলা। ক্যাপ্টেন বলেছে, পা দুটো বেঈমানি করলেও ঘাড়ের রগ বাঁকা করে চ্যালেঞ্জ করব নিজেকেই, এমন প্রত্যয়ই আমাদের জীবনের সফলতা আনবে। হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না। দাঁতে দাঁত চেপে করা কষ্ট গুলোই আমাদের বিজয়ীর খেতাব এনে দিবে।

দিনাজপুরের পার্বতীপুরের সাকিবের আর বেলকুচির ফজলুর রহমানের নেই দুই হাত আর এক পা। প্রকৃতির নিয়মের কাছে তারা হেরে গেলেও জীবনকে বেঁধে নিয়েছে নিজের নিয়মে। তাই তো এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় সাকিব জিপিএ-৫ আর ফজলুর পেয়েছে ৩.৫৬। শারীরিক প্রতিবন্ধতা আর দারিদ্র্য কোনোটাই এদের পথ রুখতে পারেনি।

আমরা বলি চোখ না থাকলে দুনিয়াই বৃথা- কিন্তু আমাদের এ বিশ্বাসকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে পাবনার চার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। শ্রুতি লেখকদের সাহায্যে তারা এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। চোখের আলো নয় মনের আলো দিয়ে তারা জীবনকে করেছে আলোকিত। দুঃসময়ের অন্ধকার কখনো আমাদের জীবনে উজ্জ্বল মুহূর্তের দ্বার খুলে দেয়। ওরা তিন জন জমজ বোন। গ্রামে মেয়েদের জন্য লেখাপড়া এমনিতেই কষ্টসাধ্য। তার ওপর অভাবের সংসার। তাই বলে কি থেমে গেছে তাদের জীবন। না এবছর একই সাথে কৃতিত্বের সাথে পার করেছে এসএসসির গণ্ডি। ওরা যেন ভাঙা ঘড়ের চাঁদের আলো।

আর সাকিব আল হাসান ক্রিকেটার নয়, চিকিৎসক হতে চায়। অভাবের সংসারে নিজের পড়ার খরচ জুগিয়েছে টিউশন করে। আর জিপি-৫ পেয়ে নজর কেড়েছে সবার। এভাবেই নিজেকে গড়ে তোলো। হতে পারে বাবা-মা আমাদের সবসময় সাপোর্ট দিতে পারবে না। এটা তাদের ব্যর্থতা নয় সীমাবদ্ধতা। তাই বলে সীমাবদ্ধতার সীমারেখা টানা যাবে না। অসীমকে জয় করার ইচ্ছাই আমাদের সীমাবদ্ধতাকে

পার করবে। এবার জানো অন্য রকম ঘটনা। চাঁদপুরের ছেংগা-চরের জেসমিনের প্রতিবন্ধী বাবা ছোটো খাটো ব্যাবসা করে। সাতজনের পরিবার তাই টিউশনি করে পড়ালেখার খরচ চালিয়ে সংসারে সহায়তা করত জেসমিন। ২০১৮ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল। পরীক্ষার আগে প্রবেশপত্র আনতে গিয়ে দেখে তার প্রবেশপত্রই আসেনি। এমনকি তার নবম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশনই হয়নি কিন্তু তার নবম ও দশম শ্রেণির সব ফি-ই পরিশোধ ছিল। এমন অবস্থা হলে তোমরা কি করতে হয়ত কোনো পদক্ষেপ নিতে অথবা লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে। কিন্তু জেসমিন হার মানেনি। ইউএনও সারমিন আক্তার সহায়তায় ২০১৯ সালে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পরীক্ষা দিয়ে ৪.২৮ পেয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশ তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করতে পারেনি। যেভাবেই হোক চেষ্টা করে গেছে। এক বছর পারেনি তো কি হয়েছে পরের বছর হয়েছে। এভাবেই দৃঢ় মনোবল আমাদের চলার পথে সব বাধাকে দূর করবে। কখনো ভেঙে পড়বে না। কিছু হারিয়ে গেলেও অন্য কোনো রূপে সেটি ফিরে আসবেই।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহারের কথা তোমরা কি জানো? জন্ম প্রতিবন্ধী নয়। তবুও প্রতিবন্ধী। একদিন বৈদুতিক খুঁটির সাথে লাগানো গাছে সকালে ছোট্ট পাখি আটকে যায়। মায়া হয় ছোট্ট বাহারের। সারাদিন অপেক্ষার পর সন্ধ্যায় নিজেই যায় পাখিটাকে মুক্ত করতে। আর তখনই ঘটে দুর্ঘটনা। বৈদুতিক শক লেগে অজ্ঞান হয়ে যায় বাহার। অবশেষে দুই হাত কেটে ফেলতে হয়। একসময় খারাপ লাগত তারপর শুরু হয় চেষ্টা। ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে লেখার অভ্যাস করে। প্রথমে কষ্ট হলেও আজ পাবলিক ভার্সিটির গর্বিত ছাত্র সে।

এমন অনেক উদাহারণ আমাদের চারপাশেই আছে। একটু চোখ মেলে দেখো। পেয়ে যাবে। তাই বলে উদাহারণ যেন শুধু চোখে আটকে না যায়; মনে গেঁথে নিবে। এগিয়ে যেতে হবে ওদের মডেল মনে করে। ভাববে ওরা পারলে আমি পারব না কেন। নিজেকে যোদ্ধা হিসেবে তৈরি কর। ময়দান থেকে যেন খালি হাতে ফিরে আসতে না হয়। জয় আমাদের হবেই। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মতো বলতে হবে- কারার ঐ লৌহকপাট/ভেঙে ফেল কর রে লোপাট... ■

ব্রত রায়-এর দুটি সাহসী ছড়া

শর্ত

হতাশ তুমি? পাও না খুঁজে বেঁচে থাকার অর্থ?
নামলে পথে দেখছো শুধু হাজার বাধা, গর্ত?
আরেকটু পথ হাঁটতে হবে
একটু আরও খাটতে হবে
সফল হওয়ার এটাই হলো একমাত্র শর্ত।

রীতি

জগতের রীতি এই কারো যদি ভালো হয়
কারো দেখি হতাশায় মুখখানি কালো হয়
অতবড় সূর্যও
রীতিমতো ব্যর্থ
একসাথে দুনিয়ার পুরোটা কি আলো হয়?

রাফি ধারাভাষ্যকার হতে চায়

মো. জামাল উদ্দিন

সাদমান সাকিব রাফি একজন বিশেষ শিশু। অন্যান্য শিশুদের মতো সে স্বাভাবিক নয়। সে শারিরীকভাবে অসুস্থ। তার বয়স যখন ৫ বছর তখন থেকে ক্রিকেট খেলাকে পছন্দ করে। টিভি চ্যানেল-এ খেলা দেখার সময় তার মনোযোগ পুরোটাই সে প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু পড়ালেখার সময় মনোযোগী হতে পারে না।

লিখতে গেলে তার শরীরের ব্যালেন্সটা হাতের উপর পড়ে। তাই সে লিখাটাও আয়ত্ত করতে পারে না। তার বাবা-মা অনেক চেষ্টা করেও তাকে লেখাপড়া শিখাতে পারেনি। অথচ ক্রিকেট যেন তাকে জাদুর মতো আকর্ষণ করে। একদিন রাফি তার বাবাকে বলল, আমাকে একটা মাঠ বানিয়ে দাও। ক্রিকেট খেলবো। (সে সবসময় বিছানার উপর অথবা খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে থাকে। টিভি দেখে অথবা রেডিও শোনে। এইভাবে সে সময় কাটায়।) তার বাবা বলল, কীভাবে? রাফি বলল, খাটের চতুর্দিক দিয়ে রশি দিয়ে ঘিরে দাও। এটা হবে বাউন্ডারি। আমি মাঝখানে বসে বোলিং করবো। রাফির কথা অনুযায়ী মাঠ তৈরি করা হলো। মাঠে বোলিং করে সে খুব আনন্দ পায়। এভাবে বেশ কিছুদিন সে খুব আনন্দ করলো।

রাফির বয়স এখন ২১ বছর। দিনের বেশিরভাগ সময় কাটায় ক্রিকেট খেলা দেখে। তাছাড়া আইপিএল, বিপিএল, ওয়ার্ল্ড কাপ খেলাগুলো যত রাতেই হোক না কেন সে লাইভ ছাড়া দেখে না। বেশি রাতে টিভি দেখলে তার বাবা-মার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে সে সেটা চায় না। মোবাইলে খেলা শোনে।

এফএম ৯২.৮ (রেডিও ভূমি) প্রিয় চ্যানেল। এই চ্যানেলের ধারাভাষ্যকার সবাই তার খুব প্রিয়। খেলার ধারা-বিবরণীর ফাঁকে ফাঁকে ভাষ্যকারগণ মজার মজার কথা বলেন, খেলা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য দেন এসব শুনে দারুণ উপভোগ করে। টিভিতে ইংরেজিতে ধারা-বিবরণী বুঝতে তার কোনো সমস্যা হয় না। সবটাই বুঝতে পারে।

এবারের বিশ্বকাপে কোন কোন দেশ খেলায় অংশগ্রহণ করেছে, কোন দেশের ক্যাপ্টেন-এর নাম কী। প্লেয়ারদের নাম কী সবই বলতে পারে। এমনকি ক্রিকেটের

পরিভাষা সবই বুঝে এবং অন্যজনকেও বুঝিয়ে বলতে পারে। কখন Wide হয়। কখন No-ball হয়, কখন LBW হয়। ওভার বাউন্ডারি, বাউন্ডারি, Maiden Over, Review, Run out, Catch ইত্যাদি সবই তার নখদর্পণে। আবার Duckworth-Lewis method বা D/L method কী এবং কেন ব্যবহার করা হয় সেটাও জানে। একুশে বইমেলা ২০১৯-এ চৌধুরী জাফর উল্লা শারাফাত-এর একটি বই বেরিয়েছে। বইটির নাম নাম্বার ওয়ান সাকিব আল হাসান। এটা সে টিভিতে বই পরিচিতি অনুষ্ঠানে দেখে মনে রেখেছিল। তার বাবাকে ওই বইটি বইমেলায় কিনতে বলেছিল। বইটি হাতে পেয়ে দারুণ খুশি। তার বাবা তাকে পড়ে শুনিয়েছে। জাফর উল্লাহ্ শারাফাত তার একজন প্রিয় ভাষ্যকার। সাকিব আল হাসান-এর প্রশংসা প্রিয় ধারাভাষ্যকার-এর লেখায় শুনে অনেক অনেক মজা পেয়েছে।

রাফির ইচ্ছা সে আবার চেষ্টা করবে, লেখাপড়া শিখবে। এমন সুন্দর বই নিজে পড়তে পারলে আরো অনেক কিছু জানতে পারতো। তার বিশ্বাস সে পারবে। কারণ রাফি ইতোমধ্যে নামাজ পড়া শিখেছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। সে অনেক বড়ো বড়ো সুরা মুখস্ত করেছে। ছোটো সুরা সে সবই মুখস্ত বলতে পারে। বড়ো সুরার মধ্যে রয়েছে– সুরা ইয়াসিন, সুরা আর রহমান, সুরা ওয়াকিয়া, সুরা মুলক, সুরা মুয্যাম্মিল ইত্যাদি। সব মিলিয়ে তার মুখস্ত সুরার সংখ্যা ৫০টি। তার বাবাও বিশ্বাস করে তার পক্ষে লেখাপড়া শিখা অসম্ভব নয়। তাই রাফির আবার নতুন মিশন শুরু হয়েছে তাকে পড়ালেখা শিখতেই হবে।

রাফির স্বপ্ন সে ধারাভাষ্যকার হবে। তাই তার বাবার কাছে বায়না করে 'আমাকে একটি মাইক্রোফোন কিনে দাও। আমি খেলার ধারাবিবরণী মাইক্রোফোনে বলব'। বাবা তার জন্য ১টি ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন কিনে দেয়। মাইক্রোফোন পেয়ে রাফি দারুণ খুশি।

এখন সে কখনও দর্শক আবার কখনও কমেন্টেটর-এর ভূমিকা পালন করে। নবারুণের বন্ধুরা, রাফির এই স্বপ্ন ও সাধনা সফল হোক– তোমরা তার জন্য দোয়া করো। ■

বাউণ্ডুলে

শফিকুল ইসলাম শফিক

এলোমেলো বইখাতা
মাঝে মাঝে কই খাতা?
কলমের কালিগুলো যায় শুকিয়ে,
পড়াশোনা চাপ বেশি
আমি বলি মাফ বেশি
ইশকুলে বেল বাজে রই লুকিয়ে।

প্রতিদিন খাই বকা
এর চেয়ে নাই বকা
ইশকুল ছেড়ে যাই দূর বিদেশে,
ভালো লাগে সব খেলা
কত কলরব খেলা
কত মজা প্রতিদিন এক নিমেষে।

মারামারি পাঠশালা
আয় খোলা মাঠ শালা
বই ছিঁড়ি খাতা ছিঁড়ি কিছু বুঝি না,
গুরুজন ফের ডাকে
পাঠে আমাদের ডাকে
কোনোদিন জীবনের মানে খুঁজি না।

এতদিন ফান করে
চালাকির ভান করে
আজ বুঝি পড়া ছাড়া হবে কে বড়ো?
কলমের বল আছে
সবুরের ফল আছে
আলসেমি ছেড়ে তাই নিজেই পড়ো।

নিবন্ধ

ভালো ছাত্র হতে স্মরণশক্তি বাড়াও

আলম শামস

ভালো ছাত্র হতে হলে স্মৃতিশক্তি বা স্মরণশক্তি প্রখর হতে হয়। সারাদিন-সারারাত পড়েও পরীক্ষার খাতায় লিখতে না পারার কারণ, পড়া মনে থাকে না। এ ধরনের ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে। আর এতে ফেল করে শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়ছে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী। তাই সমৃদ্ধ জীবনের জন্য, ভালো ছাত্র হওয়ার জন্য, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার জন্য স্মৃতিশক্তি বা স্মরণশক্তি বাড়ানো জরুরি।

স্মরণশক্তি বা স্মৃতিশক্তি বা Memory Power সকলের এক রকম হয় না। অনেক ছাত্র আছে যারা সহজে অনেক পড়া মনে রাখতে পারে। আবার অনেকে অল্প সময়ে সব ভুলে যায়। ভুল করা বা ভুলে যাওয়া মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। কথায় আছে To err is human অর্থাৎ মানুষ মাত্রই ভুল করে। কিন্তু সব সময় যদি ভুলো মনের দোহাই দেই তাহলে কিন্তু বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। আবার নানা ক্ষেত্রে হতে হয় অপদস্থ। আর এই বিড়ম্বনা ও অপদস্থের হাত থেকে রেহাই পেতে মনে রাখার কিছু সহজ কৌশল অনুসরণ করা যেতে পরে। যেমন—

- ঘুম থেকে ওঠতে দেরি হচ্ছে, মোবাইল বা ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখ। একবারের অ্যালার্মে কাজ না হলে রিপিট অ্যালার্ম ব্যবহার করো।
- স্কুল কিংবা কোচিং-এ যেতে প্রায়ই দেরি হচ্ছে, এক্ষেত্রে তোমার ব্যবহৃত মোবাইল বা ঘড়ির সময় পনের মিনিট এগিয়ে রাখ। আর এই সময় এগিয়ে রাখার ব্যাপারটা ভুলে যাও। তাহলে দেখবে নির্ধারিত সময়ের আগেই পৌঁছে যাবে গন্তব্যে।
- কোনো পড়া মুখস্থ করার আগে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নেও। মুখস্থ করার পর তা না দেখে লিখবে। লেখার পর কী কী ভুল হলো তা মিলাবে। ভুলগুলো আবার পড়বে। ভালো করে শেখা হয়ে গেলে আবার না দেখে লিখবে। এতে দেখবে ভুলের পরিমাণ অনেক কমে যাবে এবং পড়াটা স্মৃতিতে অনেক দিন থাকবে।
- একটা প্রশ্ন শেখা হয়ে গেলে কিছুক্ষণ সময় বিরতি দিবে বা পানি খাবে বা পাঁচ মিনিট বারান্দায় বা ছাদে বা বাগানে হেঁটে আসবে। এরপর নব উদ্যোমে আবার নতুন আরেকটি প্রশ্ন পূর্বের ন্যায় শেখা শুরু করবে। এভাবে প্রতিটি বিষয় প্রতিটি প্রশ্ন শিখলে ভুলে যাবার হার কমবে।
- পড়ার সময় সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে। অন্য কোনো চিন্তা মাথায় আসলে পড়া মনে থাকবে না।

- মানসিক চাপ, ক্ষোভ, হতাশা মাথায় রেখে পড়তে বসলে পড়া হবে না। সময় নষ্ট হবে পড়া মুখস্থ হবে না।
- মানব দেহের মাঝে লুকিয়ে আছে মানব মন। মন ভালো থাকলে, মাথা ঠান্ডা থাকলে সহজেই পড়া মুখস্থ হয়ে যাবে।
- মনে রাখবে দেহ পরিচালনা করে মস্তিষ্ক। দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই মস্তিষ্কের ওপর নির্ভরশীল। মস্তিষ্ক সুস্থ থাকলে শরীর ও মন সুস্থ থাকবে। পুষ্টিকর খাবার মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তির কোষগুলোকে সুস্থ রাখে।
- প্রতিদিন সুষম খাবার খেতে চেষ্টা করবে। খাওয়ার পর ফল খেতে পারো। রাতে ঘুমানোর আগে এক গ্লাস গরম দুধ খাওয়া ভালো। এতে মস্তিষ্ক সুস্থ থাকবে।
- মনে রাখবে শিক্ষাজীবনে ঘুম খুব জরুরি। নিয়মিত ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমাবে। এতে মাথা ও মন সতেজ থাকে।
- দেহের চাহিদা ও পরিশ্রম অনুযায়ী খাবার তালিকা করো। সময়মতো প্রতিবেলা সতেজ সজিব খাবার নিয়মিত খেতে হবে।
- নিয়মিত ব্যায়াম ও শরীরচর্চা দেহের পাশাপাশি মস্তিষ্ককেও সুস্থ রাখে। মস্তিষ্ক বা মাথা সুস্থ থাকলে পড়াশুনায় মনোযোগ আসবে।
- বিশেষ কোনো দিনের কথা মনে রাখতে চাইলে মোবাইলে রিমাইন্ডার দিয়ে রাখলে মোবাইল নিজেই সেই দিনটার কথা মনে করিয়ে দেবে।
- মোবাইলে নাম ও নম্বর সেভ করার সঙ্গে সঙ্গে পরিচিতজনদের জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীর দিনগুলো সেভ করে রাখ। মোবাইল নাড়তে-চাড়তে এই বিশেষ দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাবে।
- কোনো জরুরি অ্যাসাইনমেন্ট থাকলে নোটবুকে তারিখ, সময়, স্থান লিখে নাও। কী কী নিতে হবে তা আগে থেকেই গুছিয়ে রাখ। প্রয়োজনীয় ফোন নম্বরও নোটবুকে লিখে রাখ।

মনে রাখার কৌশল বা টিপসগুলো মেনে চলো, দেখবে ভুলো মন ঠিক হয়ে যাবে। ■

আলো

ম. মীজানুর রহমান

জ্ঞানের আলো দাও, আঁধারেরা সরে যাক।
অজ্ঞাত মানুষের জন্য বড়োই বিপদ!
বিজ্ঞজনে অজ্ঞরে দিন জ্ঞান-বোধ;
জ্ঞানের আলোতে সব মানুষ বেঁচে থাক।

শপথ

মাহবুব মিয়াজী

মা বলেছে, শিখতে হবে
সকল ভালো রীতি;
ন্যায়ের পথে যাও এগিয়ে
একটুও নয় ভীতি।
বাবার আদেশ, উচ্চশিরে
সত্য কথা বলো,
সত্যটুকু বলার আগে
সত্য পথে চলো।
গুরুজনের আদেশ- নিষেধ
অমূল্য সে বাণী,
চলার পথের এই পাথেয়
সোনার চেয়ে দামি।
এই তো শপথ নিলাম সবাই
বারংবারে বলি,
পিতা- মাতার বিধান মেনে
সরল পথে চলি।

গল্প

মুমুর দল ও ভণ্ড পশু চোর

হালিমা রীমা

মুমু আজ বিকেলে সবাইকে আসতে বলেছে স্কুলের মাঠে জরুরি সভা করার জন্য। বেশ কিছুদিন যাবৎ সবাই বিষয়টা নিয়ে চিন্তিত। তাদের এলাকায় একের পর এক পোষা কুকুর বেড়াল গায়েব হয়ে যাচ্ছে। তাই আজ রুমি,টিনা, রফিক, যতিন,তিন্নি, গফুর,মিনা সবাই মিলে বিষয়টা আলোচনা করে দেখবে।

প্রথমেই তিন্নির কালো হুলো বেড়ালটা গায়েব হয়। পরে গফুরের কুকুর ভোলা তারপর মুমুর কুকুর কিটি। আবির একটু ভিতু প্রকৃতির আর মাকে ছাড়া কোথাও যায় না। আজ আবির নিজেই দৌড়াতে দৌড়াতে এসে হাজির। এসেই ভ্যা কান্না জুড়ে দিল। সবাই জানতে চাইল কী হয়েছে। এতে আবিরের কান্না আরো বেড়ে গেল। এবার মুমু ধমক দিয়ে বলল, আহা বলো কী হয়েছে আর আমাদের সভায় কান্নাকাটি করা যায় না। আবির যা বলল তার সারমর্ম হচ্ছে আবিরের খরগোশটাকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

মুমু সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল। তার মানে শুধু কুকুর বিড়াল নয় পোষা সব প্রাণীর দিকেই চোরের নজর। এবার তিন্নি বলল চোরটাকে পেলে সবাই মিলে মজাটা বুঝিয়ে দিতাম। আমি ক্যারাটে ক্লাসে কিছু টেকনিক শিখেছি চোরকে নাস্তানাবুদ করে দিব আমি একাই। মুমু তিন্নিকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আগে তো চোরকে পেতে হবে তারপরেই না। আর আইন নিজের হাতে তুলে নিতে হয় না আমার আংকেল বলেছে। আমরা চোরকে ধরে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিব।

দলের সবচাইতে ভাবুক এবং ভীতু হলো রফিক। সে বলল, আচ্ছা এমন তো নয় ভূত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর তাদের রক্ত খাচ্ছে। এই কথা শুনে গফুর আর আবির কাঁদতে লেগে

গেল। মুমু এবার সবাইকে ধমকের সুরে বলল, যারা সভার নিয়ম ভাঙবে তাদেরকে সভা থেকে বের করে দেওয়া হবে। সভায় অপ্রয়োজনীয় কথা বলা আর কান্নাকাটি নিষিদ্ধ।

এবার বেশ গম্ভীর স্বরে মুমু বলল, আজ থেকে আমরা সবাই বাড়ির আশপাশে নজর রাখব। তারপর যতিনের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার বাসায় একটা ময়না আছে না। তুমি সাবধানে থাকবে আর পাখিটাকে নজরে রাখবে। যতিন চোখ গোল গোল করে তোতলাতে তোতলাতে বলল কী......ব......ল আ... মা...র ম...ইয় ......না ! মুমু ছাড়া সবাই একসাথে হেসে উঠল। যতিন ভয় পেলে তোতলাতে থাকে। এবার মুমু বিরক্ত হয়ে সবার দিকে তাকালো। সবাই সাথে সাথে চুপ হয়ে গেল। মুমু সবার দিকে তাকিয়ে বলল আমরা দুই দিন পর আবার বসব।

আজ আবার সবাই মিলে বসেছে। আবির সবার আগে এসে উপস্থিত। আস্তে আস্তে সবাই এসে পড়ল শুধু যতিন আসেনি। তিন্নি বলল, সে একজন জটাধারী গেরুয়া পোশাক পড়া লোক দেখেছে তার বাড়ির পাশে। পর পর দুই দিন ; আগে যাকে কোনোদিন দেখা যায়নি। এবার যতিন আসলো, তার চোখ-মুখ লাল। এসেই বলল আজ দুপুর থেকে তার ময়না গায়েব। সারাদিন ময়না তার সঙ্গেই ছিল। দুপুরে যখন গোসলে গিয়েছিল তখন তার মা ছিল বাড়ির কাজে ব্যস্ত।

বাথরুম থেকে বের হয়ে দেখে খাঁচার দরজাটা খোলা আর ময়নাটা গায়েব। মুমু সব শুনে বলল, আর কেউ কোনো অস্বাভাবিক কিছু দেখেছ? রফিক বলল ইদানীং পাড়ার পাগলিটা বেশি ঘুর ঘুর করে। আর তার ইয়া বড়ো একটা ঝোলা আছে। মুমু সব শুনে বলল, তবে কাল যেহেতু সবার স্কুল বন্ধ আমরা সকালে একসাথে হয়ে চল জটাধারীকে আর পাগলিটাকে অনুসরণ করি। সবাই একমত হয়ে বাসায় চলে গেল।

পরের দিন সবাই মাঠে খেলার নাম করে বাসা থেকে বের হলো। ওরা সবাই ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। ওরা দুইভাগে ভাগ হয়ে গেল। একটি দলে মুমু, যতিন, টিনা, মিনা আর অন্য দলে তিন্নি, গফুর, রুমি ও আবির। মুমুর দল জটাধারী লোককে আর তিন্নির দল পাগলিটাকে অনুসরণ করবে বলে ঠিক করল।

তিন্নিরা কিছুক্ষণ পরই পাগলিটাকে দেখতে পেল। সবাই একটু দূর থেকে অনুসরণ করতে লেগে গেল। ওরা দেখল পাগলিটা কিছুদূর গিয়ে তার ঝুলা খুলে রাজ্যের ফেলে দেওয়া জিনিস বের করতে লাগল। তারপর সে আপনমনে খেলতে লেগে গেল। কিছুক্ষণ পর গাছের তলায় ঘুমিয়ে গেল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও ওরা জটাধারীকে দেখতে পেল না। তাই সবাই বাসার দিকে রওয়ানা হলো।

যতিন বাসায় ফেরার পথে হঠাৎ জটাধারীর সন্ধান পেল। দেখল ইয়া বড়ো গোঁফ, চোখ দুইটি টকটকে লাল, গলায় শামুকের মালা, হাতে লাঠি আর মাথায় লাল লাল লম্বা চুলের জটা। যতিন সাহস করে পিছু নিল। দেখল জটাধারী কাছেই জঙ্গলে ঢুকে গেল। যতিন আরেকটু এগুতেই আচমকা জটাধারী পিছন ফিরে তাকাল। আর যায় কোথায় ! যতিন ওরে বাবারে বলে দিল এক দৌড়। আর পিছন ফিরে তাকায়নি।

পরেরদিন ওরা আবার একসাথে হলো। তিন্নির দল তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানালো। যতিন হন্তদন্ত হয়ে এসেই বলতে শুরু করল। সে বলল 'জটাধারী তার দিকে যখন তাকিয়েছিল তখন তার চোখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছিল। আরেকটু দেরি হলেই সে আগুনে পুড়ে যেত। আর জটাধারী একটা ভূত। থাকে ঐ কাছের জঙ্গলের শ্যাওড়া গাছে।' সঙ্গে সঙ্গে রফিক বলল... বলেছিলাম না ভূতের কাণ্ড।

মুমু সব শুনে বলল তবে আজ চল সবাই মিলে জঙ্গলে যাই দেখি কেমন ভূত ! রফিক ভয়ে ভয়ে বলল আমি যাব না যতিনও সুর মেলালো। এবার মুমু বলল 'দেখ আমরা' সবাই আমাদের পোষা প্রাণীকে ভালোবাসি আর সবাই চাই আমাদের প্রিয় পোষা প্রাণীকে ফিরে পেতে। তাই ভেবে বলো, কে কে যাবে আর আমরা একসাথে থাকলে ভূতও কিছু করতে পারবে না।' এবার সবাই যাবে বলে মনস্থির করল।

বিকেলের আলো থাকতেই সবাই রওয়ানা হয়ে গেল জঙ্গলের দিকে। অনেকদূর হেঁটে ভিতরে গিয়ে একটা কুঁড়ে ঘর দেখতে পেল। ওরা পা টিপে টিপে কাছে গিয়ে দুজন মানুষের কথা শুনতে পেল। কেউ একজন বলছে সব আয়োজন শেষ এখন একটা মানুষের বাচ্চা লাগবে। তাহলেই আমরা যজ্ঞ শুরু করতে পারব। দেখবি যেন বাচ্চাটি একমাত্র সন্তান হয়। বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে সবার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। কারণ সবার পোষা প্রাণীকে তারা দেখতে পেল।

শুনে সবার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মুমু সঙ্গে সঙ্গে রফিককে বলল কাছের থানায় আর বাবা-মাকে বিষয়টা জানাতে। রফিক ভয়ে তখন আধমরা। মুমুর ধমকে আর কিছু না বলে জোরে বাড়ির পথে হাঁটা দিল। মুমু বলল আমরা দুজন দুজন করে ভাগ হয়ে যাব যাতে একটা দল ধরা পড়লে অন্য দল সাহায্য করতে পারি।

মুমু আর যতিন এক দলে আর তিন্নি ,টিনা দ্বিতীয় আর রুমি, আবির একসাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিল। মুমু আর যতিন একটু এগিয়ে গেল। হঠাৎ যতিনের ময়না যতিনকে দেখেই ডাকা শুরু করল 'যতিন যতিন বস বস'। সঙ্গে সঙ্গেই জটাধারী আর তার সাগরেদ ওদের দুজনকে দেখে ফেলল। ওরা দৌড় দেবার আগেই ওদেরকে ধরে ফেলল। সাগরেদটা যতিনকে দেখিয়ে বলল, বাবা এই ছেলেটা একমাত্র সন্তান। চলেন একে বলি দেই। আর মেয়েটাকে নিয়ে পরে ভাবা যাবে।

যতিন বলি দেবার কথা শুনেই ভয়ে আধমরা হয়ে গেল। মুমুও খুব ভয় পেয়ে গেল যদিও বিষয়টা বুঝতে দিল না।

জটাধারী বলল, তোরা এখানে কেন এসেছিস? মুমু সাহসের সাথে বলল, ছোটোদের সাথে তুই করে কথা বলছেন কেন?

জটাধারী বিকট স্বরে কেঁপে কেঁপে শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগল। এবার বলল, বিচ্ছু দুইটাকে বেঁধে ফেলো শক্ত করে।

এবার সব প্রাণীদের সাথে যতিনকে কপালে রং মেখে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর যতিনকে দুধ দিয়ে গোসল করিয়ে সাদা আলখেল্লার মতো পোশাক পরিয়ে দিল। যতিনের নাকে কিছু একটা ধরতেই যতিনের চোখ লাল হয়ে গেল। কেমন যেন বেসামালভাবে হাঁটছিল। মুমু তাড়াতাড়ি চিন্তা করতে লাগল কীভাবে ওদের কাজে দেরি করিয়ে দেওয়া যায়।

এরপর যতিনকে এবং সব প্রাণী একসাথে রেখে হিম গলায় বিড়বিড় করে পিশাচ ভণ্ড জটাধারী মন্ত্র পড়তে লাগল আর কিছুক্ষণ পর পর লাল রঙের কিছু ছিটিয়ে দিচ্ছিল সবার দিকে।

মুমু হঠাৎ জোরে চিৎকার করে বলতে লাগল তিন্নি , আবির , টিনা সবাই যাও পাড়ার সবাইকে ডেকে নিয়ে আসো। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থাকা সবাই দিল এক দৌড়। অনেকগুলো পায়ের আওয়াজে জটাধারী আর তার সাগরেদ ভয় পেয়ে গেল।

পশুচোর জটাধারীটা এসে মুমুকে ধমক দিল আর মুখটা শক্ত করে বেঁধে দিল। সাগরেদটা বাইরে দেখার জন্য দৌড় দিল কিন্তু কাউকে ধরতে পারল না।

এবার পিশাচ পশু চোর বলল, তাড়াতাড়ি করো। আমরা বলি দিয়েই এখান থেকে কেটে পড়ব। বলি দেওয়া হয়ে গেলেই আমি হব সর্বশক্তির অধিকারী। এবার জটাধারী ঠিক পিশাচের মতো করে হাসতে লাগল।

মুমু দ্রুত চিন্তা করে নেয়। কিন্তু তার হাত-মুখ সব শক্ত করে বাঁধা। মুমু পায়ের কাছে পড়ে থাকা পাথর পা দিয়ে সজোরে লাথি দিয়ে দিল জটাধারীর গায়ে। ঠিক কপালে লেগে কপালটা কেটে গেল। লোকটি আহ শব্দ করে কপাল চেপে ধরল। দুষ্টু লোকটির কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছিল তখন।

এবার দুষ্টু লোকটি মুমুকে আঘাত করতে গেল। মুমু পা ছুঁড়তে লাগল। ঠিক তখনই রফিকের সাথে পুলিশ আংকেলরা ঢুকে পড়ল। পুলিশ জটাধারী আর তার সাগরেদকে হাতকড়া পড়িয়ে ধরে গাড়িতে তুলল। পাড়া প্রতিবেশী আর পুলিশ মুমু ও তার দলকে অনেক বাহবা দিল। সবাই তাদের প্রিয় প্রাণীকে পেয়ে খুব খুশি। যতিনকে হাসপাতালে নেওয়া হলো। একদিন পরই সে সুস্থ হয়ে ফিরে এল।

পরেরদিন পত্রিকায় ওদের সাহসিকতার গল্প ছবিসহ ছাপা হলো। এভাবেই মুমু ও তার বন্ধুরা সফল হয়েছিল। একসাথে মিলে কাজ করলে অসাধ্যকে সাধন করা সম্ভব। ■

আগুনে পিঁপড়ের কথা

আমির খসরু সেলিম

পিঁপড়ের জ্বালায় অনেক সময় অতিষ্ঠ হয়ে উঠি আমরা। লাল-কালো নানা রঙের, ছোটো-বড়ো নানা আকারের পিঁপড়েরা প্রায়ই ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। লুকিয়ে রাখা খাবারের খোঁজও ওরা কীভাবে যেন পেয়ে যায়। ওদের সাথে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছেন না আমাদের আম্মুরাও। তার উপর কাপড়ের ভাঁজে বা কানের ফুটোয় ঢুকে পড়া, শরীরের এখানে ওখানে কুটুস করে কামড় দেওয়া, এসব তো আছেই। সবকিছু মিলিয়েই পিঁপড়েদের সঙ্গে মানুষের নিয়মিত দেখা আর টের পাওয়া ঘটে যায়।

পৃথিবী জুড়ে ১২শ প্রজাতির পিঁপড়ের দেখা মিলবে। বিজ্ঞানীরা বলেন, আরো খোঁজখবর করলে এই প্রজাতির সংখ্যা ১৪শ ছাড়িয়ে যাবে। এই পিঁপড়ে কুলেরই এক নামজাদা প্রজাতি হলো 'ফায়ার অ্যান্ট' বা 'আগুনে পিঁপড়ে'। নামের মতোই এদের কাজের বাহার। ধারালো একজোড়া চোয়ালের কামড় যদি কারো শরীরের কোথাও বসিয়ে দিতে পারে, তাহলেই খবর আছে। আক্রান্ত জায়গায় আগুনে পোড়ার মতো জ্বালা করতে থাকে। আমাদের দেশে 'পেট-লাল' বিষ পিঁপড়েরও চেয়ে ফায়ার অ্যান্টের বিষের জ্বালা অনেকগুণ বেশি।

তবে সুখের ব্যাপার হলো, আমাদের দেশে এই 'আগুন কামড়' খাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ, ফায়ার অ্যান্টের মূল আবাসভূমি ব্রাজিলে। ব্রাজিলের অরণ্যময় এলাকায় এরা মহাদর্পে দাপিয়ে বেড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারা খুব সমস্যায় না পড়লে ফায়ার অ্যান্টকে ঘাঁটে না।

এই ফায়ার অ্যান্টকে নিয়ে একবার ঘটল বিচিত্র ঘটনা। এদের মূল নিবাস ব্রাজিল ছেড়ে কীভাবে যেন পৌঁছে গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। হয়ত কোনো পণ্য পরিবহণের মাধ্যমে লুকিয়ে এদের কিছু জাতভাই চলে গিয়েছিল সুদূর আমেরিকা। সেখানে গিয়ে আগুনে পিঁপড়ে মহাসুখে বংশবিস্তার করতে লাগল। ব্রাজিলের বাসিন্দারা না হয় জন্ম থেকেই এদের সাথে পরিচিত। কিন্তু মার্কিনীরা ফায়ার অ্যান্টের আগুন কামড় খেয়ে পুরোপুরি ভ্যাবাচ্যাকা। এদিকে স্রোতের মতো বেড়ে চলছে পিঁপড়ের সংখ্যা। যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল এদের অত্যাচারে। বিজ্ঞানীরাও ভেবেচিন্তে কোনো কূলকিনারা পেলেন না কীভাবে এই ক্ষুদ্র কিন্তু মারাত্মক প্রাণীর বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়; কেউ বুঝতে পারছিল না।

কেউ যখন কোনো উপায় বের করতে পারছিল না তখন এক বিচিত্র পদ্ধতিতে এর সমাধান হয়েছিল। দক্ষিণ আমেরিকায় একজাতের খুদে মাছি আছে যার নাম 'সিউডাকটিওন'। এই মাছিরা কি মনে করে ডিম পাড়া শুরু করে দিল ঠিক ফায়ার অ্যান্টের ঘাড়ের ওপর। সেই ডিম ফুটে মাছির শূককীট বের হলো। আর সেই ছোট্ট শিশু-মাছিরা খেয়ে ফেলল 'আগুনে পিঁপড়ের' ঘাড়। ফলে পিঁপড়েদের ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মাথা। এভাবেই এই বিচিত্র সমস্যার সমাধান হলো তার চেয়েও বিচিত্র উপায়ে। ■

পানিতে ভেসে চলছে আগুনে-পিঁপড়ের বাহিনী

পিঁপড়ে গল্প

লাল পিঁপড়ে

ফারদিন শামস তিমির

এক বনে থাকত এক লাল পিঁপড়ে। তার কোনো বন্ধু ছিল না। একাকী তার জীবন কাটত। একদিন সে খাবার খুঁজতে বনের ভিতর খুব দূরে গেল এবং তার ওজনের চেয়ে ৫০ গুণ বেশি পরিমাণের এক খাবারের টুকরা পেল, সেই খাবারের টুকরা নিয়ে সে বাড়ির দিকে ফিরছিল।

পথে এক বিষ পিঁপড়ের সাথে তার দেখা হলো। সে মোটা কণ্ঠে বলল, তুই আমাকে এই খাবার দিয়ে দে এই বলে সে জোর করে খাবারের টুকরাটি কেড়ে নিল ও বাড়ি চলে গেল। ফলে লাল পিঁপড়া মনের দুঃখে কাঁদতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ পর এক মৌমাছি দেখল সে কাঁদছে। তাই সে তার কাছে গেল ও বলল, আরে ও ভাই পিঁপড়া! কাঁদছ কেন ?

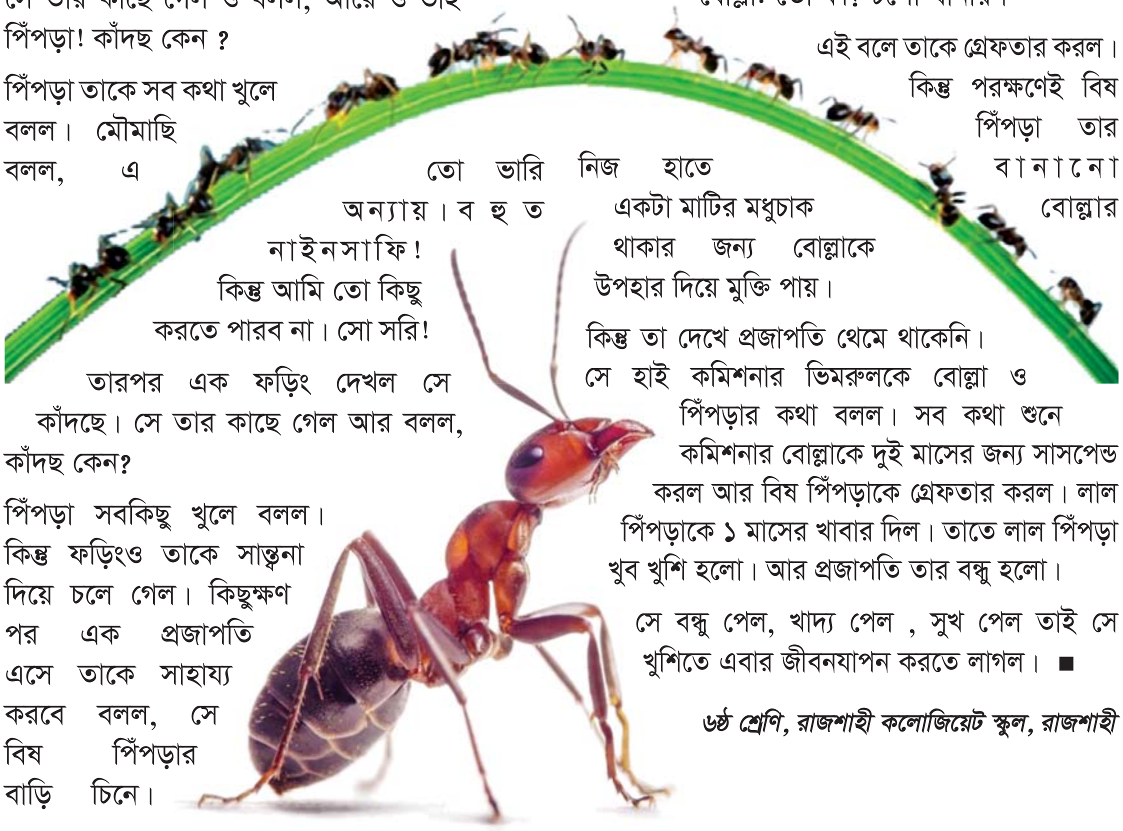

পিঁপড়া তাকে সব কথা খুলে বলল। মৌমাছি বলল, এ তো ভারি অন্যায়। ব হু ত নাইনসাফি! কিন্তু আমি তো কিছু করতে পারব না। সো সরি!

তারপর এক ফড়িং দেখল সে কাঁদছে। সে তার কাছে গেল আর বলল, কাঁদছ কেন?

পিঁপড়া সবকিছু খুলে বলল। কিন্তু ফড়িংও তাকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর এক প্রজাপতি এসে তাকে সাহায্য করবে বলল, সে বিষ পিঁপড়ার বাড়ি চিনে।

প্রজাপতি বিষ পিঁপড়ার বাড়ি গিয়ে বলল, তুমি লাল পিঁপড়ার খাবার কেড়েছ ?

বিষ পিঁপড়া :-হ্যাঁ, তো।

প্রজাপতি: দিয়ে দাও।

বিষ পিঁপড়া : আমি ওটা খেয়ে ফেলেছি। যা -Testy!

প্রজাপতি : কী ?

বিষ পিঁপড়া : হ্যাঁ

প্রজাপতি: জানো, এটি একটা অপরাধ। আমি পুলিশ ইন্সপেক্টর বোল্লা বাবুকে ডাকব।

এ কথা শুনে বিষ পিঁপড়া হা হা হা হেসে বলল, ডাকো! ডাকো!

প্রজাপতি সত্যি সত্যি ডাকল, বোল্লা এসে বলল, তুমি খাবার চুরি করেছ ?

বিষ পিঁপড়া: হ্যাঁ, তো

বোল্লা: তো কী? চলো থানায়।

এই বলে তাকে গ্রেফতার করল। কিন্তু পরক্ষণেই বিষ পিঁপড়া তার নিজ হাতে বানানো একটা মাটির মধুচাক বোল্লার থাকার জন্য বোল্লাকে উপহার দিয়ে মুক্তি পায়।

কিন্তু তা দেখে প্রজাপতি থেমে থাকেনি। সে হাই কমিশনার ভিমরুলকে বোল্লা ও পিঁপড়ার কথা বলল। সব কথা শুনে কমিশনার বোল্লাকে দুই মাসের জন্য সাসপেন্ড করল আর বিষ পিঁপড়াকে গ্রেফতার করল। লাল পিঁপড়াকে ১ মাসের খাবার দিল। তাতে লাল পিঁপড়া খুব খুশি হলো। আর প্রজাপতি তার বন্ধু হলো।

সে বন্ধু পেল, খাদ্য পেল , সুখ পেল তাই সে খুশিতে এবার জীবনযাপন করতে লাগল। ■

৬ষ্ঠ শ্রেণি, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী

একতাবদ্ধ এক পিঁপড়ে সমাজ

এম আতিকুল ইসলাম

গ্রামের শেষদিকে এক কৃষক বাড়ি। বাড়িতে আছে বড়ো দুটো ধানের গোলা। গোলার হালকা কাছেই সংসার পেতেছে কিছু লাল আর কালো পিঁপড়ে। চারিদিকে যেন খাবারের উৎসব। বাড়ির পাশের ধানক্ষেতের কচি ধানের পাতা কচকচ করে খায় পিঁপড়ে দল। মাঠ পাকা ধান কুটকুট করে খেতে কী যে মজা! কাছেই চিনিকলে আখ মাড়াই করে রস জ্বাল দিয়ে বানানো হয় চিনি। চিনি খেয়ে পিঁপড়ে দল আনন্দে ধেই ধেই করে নাচে। রাতে চলে গল্প-গুজব।

মৌমাছি, প্রজাপতি আর পাখিদের সাথে পিঁপড়েদের অনেক ভাব। এমনকি ধেড়ে ইঁদুরও অগ্রহায়ণে এক মুঠো পাকা ধান পিঁপড়েদের উপহার দেয়। তারা একসাথে খাবার ভাগাভাগি করে খায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো,পিঁপড়েরা অন্যদের সাথে মিশলেও নিজেদের মধ্যে দুটি ভাগে বিভক্ত। কালো আর লাল পিঁপড়ে, এক দল আরেক দলের ছায়াও মাড়ায় না। এদিকে শীত চলে আসল। একটু একটু করে ঠান্ডা বাড়তে থাকে। কলোনিগুলোতে নেমে এল নিদারুণ কষ্ট। টিনের ঘরের নিচের ফাঁক দিয়ে হু হু করে উত্তরের হাওয়া বইতে শুরু করে। শীতে সবাই কাঁপতে থাকে। কনকনে ঠান্ডায় কিছু পিঁপড়ে মারা পড়ে। কালো আর লাল দুই শিবিরে একই অবস্থা।

‘কিছু একটা করুন মহারানি’ সাধারণ পিঁপড়েদের কাতর স্বরে রানি বিচলিত হয়ে পড়ল। কিন্তু কী করা যায়! অনেক ভেবেচিন্তে দুই শিবিরের মহারানি নিজেদের মধ্যে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নিল। এমন বড়ো বিপদে নিজেদের মধ্যে একতা রাখতে হবে। একা কোনো দলের পক্ষে এ বিপদ সামাল দেওয়া যাবে না।

শুরু হলো বৈঠক। একজন প্রস্তাব করল, নিচের ফাঁকা অংশ বেশ কিছু পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হোক। ঘরের পাশের কাঁঠাল গাছটা থেকে গোটা তিনেক পাতা ছিঁড়তে হবে। তারপর সেই পাতাগুলো কাঁঠাল গাছের আঠা দিয়ে টিনের বেড়ার সাথে লাগাতে হবে। কিন্তু এ সমাধানে কেউ রাজি হলো না। এ শীতে ঘর থেকে বের হলে বিপদ আরো বাড়বে। তাছাড়া কাঁঠাল পাতা দুই একদিনের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে। সমাধান এ ঘর থেকেই বের করতে হবে।

এক বুড়ো পিঁপড়ে পরামর্শ দিল, নিচের ফাঁকা অংশ কাপড় দিয়ে ঢাকতে হবে। তাই আমাদের প্রথম কাজ হবে, এক টুকরো কাপড় খুঁজে বের করা। সেই কাপড় মাথায় করে কলোনিতে বয়ে নিতে হবে। তারপর দুপাশ থেকে টান টান করে মেলে ধরে ভারী কিছু দিয়ে ঠেস দিয়ে রাখতে হবে। তবেই মিলবে ঠান্ডা থেকে মুক্তি। কিন্তু এ যে রাজ্যের কাজ ! আলোচনা সভায় সহজে পথ বাতলে দিলেও বাস্তব অনেক কঠিন। আজ আর পিছনে ফেরার সময় নেই। যত কঠিনই হোক, এ কাজ তাদের করতেই হবে।

পরেরদিন সবাই এক সাথে কাজে নেমে পড়ে। নিজেদের টিকে থাকার লড়াইয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে। কে কালো, কে লাল, কে লম্বা, কে বেঁটে, কে সুন্দর, কে অসুন্দর; কোনো কিছুই আজ তাদের মাথায় আসছে না। সবারই আজ একটাই শপথ, এ পিঁপড়ে সমাজকে বাঁচাতে হবে। সারাদিন অনেক খাটাখাটুনির পর একটি কাপড়ের পর্দা ঝুলানো হলো। তাতে শীতের প্রকোপ অনেকখানি কমে এল। এরপর থেকে তারা নিজেদের গায়ের রঙের ভিন্নতা বেমালুম ভুলে গেল। ■

নিবন্ধ

সড়কে নিরাপদ থাকো নিরাপদ রাখো

রেজা উন নবী (রেজান)

অন্তু পড়ে চতুর্থ শ্রেণিতে। সে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে এসেছে। আসার সময় তার মা-বাবা লক্ষ্য করলেন রাস্তা ও গাড়িতে ট্রাফিক নিয়মে কিছু অনিয়ম হয়েছে। তাই নতুন জায়গায় এসে সে যথেষ্ট ক্লান্ত ও কনফিউস্‌ড। সে এসেছে এখানে তিন দিন দুই রাতের জন্য বেড়াতে। দ্বিতীয় দিন আশপাশটা ঘুরে দেখার সময় অন্তু রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ায়। অন্তু মোবাইলে গেম খেলছিল তাই সে অন্যমনস্ক। হঠাৎ একটা ট্রাক আসছে। ট্রাকটা হর্ন বাজাচ্ছে কিন্তু অন্তু পাশে যাচ্ছে না। মাত্র কয়েক ফুট জায়গা বাকি রেখে ট্রাকটা থামল। সে যথেষ্ট ভয় পেয়েছে। তার মা এসে তাকে জড়িয়ে কান্না শুরু করে দিল। বাড়ি এসে তার বাবা ট্রাফিক নিয়ম নিয়ে আলোচনা করলেন।

ছোটোদের জন্য নিয়ম (৬-১৮ বছর)

- ❑ রাস্তা পারাপারের জন্য জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করা
- ❑ ট্রাফিক লাইট থাকলে লাল আলো হলে পথচারী যাবে, গাড়ি থামবে
- ❑ সবুজ আলো হলে গাড়ি যাবে, পথচারী থামবে
- ❑ আর ট্রাফিক লাইট না থাকলে ডানে দুইবার বামে দুইবার তাকিয়ে রাস্তা ফাঁকা থাকলে যেতে হবে
- ❑ সবসময় পথচারীদের ডান পাশ দিয়ে হাঁটতে হবে
- ❑ রাস্তা পারাপারে ফুটওভার ব্রিজ থাকলে সেটি ব্যবহার করতে হবে
- ❑ রাস্তা পারাপারে সময় মোবাইল ফোন বা কোনো খেলনার ব্যবহার করা যাবে না। রাস্তায় খেলা করা যাবে না
- ❑ দৌড়িয়ে না গিয়ে হেঁটে এবং সতর্কতার সাথে রাস্তা পারাপার হতে হবে।

পথচারী হিসেবে দায়িত্ব (সকল বয়স)

- ❑ ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে চলা
- ❑ ফুটপাথ দিয়ে চলাচল করা। ফুটপাথ না থাকলে রাস্তার ডান পাশ দিয়ে হাঁটা
- ❑ রাস্তায় অমনোযোগী না হওয়া। দ্রুত বেগে অথবা দৌড়ে রাস্তা পার না হওয়া
- ❑ লাল বাতি জ্বলন্ত অবস্থায় রেল ক্রসিং পার না হওয়া। দুই যানবাহনের মাঝ দিয়ে চলাচল না করা।

এসব নিয়ম শুনতে শুনতে অন্তু হাঁপিয়ে গেছে। সে পানি খেয়ে আবার শুনতে শুরু করল। তার বাবা তাকে একটি ছক দিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক সাইন দেখাল।

সে স্কুলের দিন তার স্যারকে পুরো ঘটনা বলল। স্যার তাকে সান্ত্বনা দিল। এরপর থেকে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলে। একদিন সে তার বন্ধু তমুকে বলল, তুই ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলিস?

তমু প্রতি উত্তরে বলল: এখন ট্রাফিক নিয়ম কেউ মানে না। তাই আমিও মানি না। আর শ্রেণিকক্ষের কেউই মানে না।

অন্তু তার সেই দুঃস্বপ্নের কথা বলল। সে বুঝাল যে ট্রাফিক নিয়ম কতটা জরুরি। তমু অন্তুর কাছ থেকে ট্রাফিক নিয়ম শুনে নিল। আর টিফিনে খেলার মাঠে তার ক্লাসের সবাইকে ডেকে নিল। তারপর ট্রাফিক নিয়ম শেখার জন্য শুক্রবার সবাইকে স্কুলে আসতে বলল। আর হেডমাস্টারকে অনুরোধ করে স্কুলের গেট খুলে দেওয়ার অনুমতি নিল।

গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক সাইন

অন্তু তার বাবাকে বিষয়টি জানিয়ে দিল। তার বাবা ট্রাফিক নিয়মগুলো খাতায় লিখে রাখলেন। তারপর সেগুলো ৭৫ জনের জন্যে ১টি করে কপি করলেন। আর অন্তুকে বললেন, তুই এগুলো তোর বন্ধুদের ১টি করে দিস।

অন্তু বলল, আচ্ছা।

শুক্রবারে অন্তুর শ্রেণিকক্ষের সব শিক্ষার্থী এল। অন্তু ও তমু দুইজন মিলে শ্রেণিকক্ষের সব শিক্ষার্থীকে লিফলেট বিলিয়ে দিল। আর হেডমাস্টারকেও একটা দিল। বাকি ১০টা লিফলেট শিক্ষকদের দিল। তারপর অন্তু সবাইকে লিফলেটটি পড়তে বলল। সবাই পড়ল।

একজন হাত তুলে বলল, ট্রাফিক নিয়ম কেউ মানে না। না মানলে খবরের কাগজ খুলে দেখ সড়ক দুর্ঘটনায় হাজার হাজার মানুষ মরে যাচ্ছে। কারণ ট্রাফিক নিয়ম না মানার জন্য। গত বছর মানে ২০১৮ সালে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মারা গিয়েছে বলে ছাত্ররা সড়কে বিক্ষোভ শুরু করল অন্তু বলল। মাথা নিচু করে চুপ হয়ে গেল সবাই।

সে আরো বলল, পথচারী এবং গাড়ি চালককেও এসব তথ্য জানাতে হবে। জনগণকে সচেতন করতে হবে। ট্রাফিক নিয়ম না মানলে মৃত্যু অবধারিত। 'নিরাপদ সড়ক চাই' একথাটির মানে হলো জনগণকে সচেতন করা, দক্ষ চালক নির্বাচন করা ঠিকভাবে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলা এবং ট্রাফিক নিয়ম মেনে গাড়ি চালানো।

এরপর হেডমাস্টার বক্তব্যে বললেন, অন্তু তার অভিজ্ঞতা থেকে ট্রাফিক নিয়ম মেনেছে। আর এই অভিজ্ঞতা যেন কারো না হয় তাই বুদ্ধিমানের মতো সভাটি করল।

আমি গর্বিত হয়ে বলতে পারি এই স্কুল প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এই প্রথম এক শিক্ষার্থী সে এমন একটি ভালো কাজ করল। তাই আমি তাকে পুরস্কৃত করব। তার জন্য জোড়ে হাততালি দাও সবাই।

সবাই হাততালি দিল। অন্তু তো হিরো বনে গেল তার স্কুলে। ■

৪র্থ শ্রেণি, ঝিনাইদহ কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ

গল্প

ভাষা দাদুর সঙ্গে

কাটাকাটি

তারিক মনজুর

নেহা ওর ছোটো ভাইয়ের সাথে খাতায় কাটাকাটি খেলছিল। হঠাৎ একটু কথা কাটাকাটি হলো; আর দুজন দুদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকল। ওভাবেই হয়ত থাকত ওরা। কিন্তু ভাষা-দাদুকে দেখে দুজনেই হইহই করে উঠল, 'দাদু! এতদিন পরে এলে?'

ভাষা-দাদু থাকেন পাশের বাড়িতে। ভাষা নিয়ে অনেক কিছু জানেন। সুযোগ পেলেই নেহাদের বাড়িতে আসেন। কিন্তু গত এক মাসে একবারও তাঁর দেখা পায়নি নেহারা।

'দাদু, এতদিন তুমি কোথায় লুকিয়ে ছিলে?'

দাদু বসতে বসতে বললেন, 'বলছি। তার আগে বলো তোমরা কী করছিলে?'

নেহা আর ওর ভাই আবার দুদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসল। দাদু ওদের খাতা আর অবস্থা দেখে ঠিক বুঝে নিলেন কী হয়েছে। বললেন, 'প্রথমে খাতায় কাটাকাটি খেলা; তারপর কথা কাটাকাটি। তাই না?'

দুজনে তাও কোনো কথা বলে না। ভাষা-দাদু তখন আচ্ছা করে হেসে নিলেন। তারপর বললেন, 'আজ সময় কাটানোর জন্য নতুন খেলা পাওয়া গেল!'

'কী খেলা? কী খেলা?' দুজনেই একসঙ্গে বলে ওঠে।

দাদু বললেন, 'অনেক রকম 'কাটা'ই তো আছে। দেখা যাক, কে কতরকম 'কাটা'র কথা বলতে পারো।'

নেহার ভাই নাবি ভ্রূ কুঁচকে ফেলল। বলল, 'কাঁটা? ...আমি তো জানি ফুলে কাঁটা থাকে। যেমন, গোলাপ ফুলের কাঁটা।'

নেহা বলল, 'চুলের কাঁটাও আছে।'

ভাষা-দাদু হেসে ফেললেন। বললেন, 'গোলাপের কাঁটা, বেলের কাঁটা, ফণীমনসার কাঁটা এ রকম অনেক কাঁটা আছে। আবার, চুলের কাঁটার মতো আছে উল দিয়ে সোয়েটার বোনার কাঁটা। কিন্তু ওসব কাঁটা আমি চাচ্ছি না।'

'তাহলে তুমি কেমন কাঁটা চাও?' জানতে চায় নাবি।

'ওই কাঁটাগুলোতে চন্দ্রবিন্দু আছে। আমি চাচ্ছি, চন্দ্রবিন্দু ছাড়া কে কয়টা কাটা বলতে পারে। এই যেমন ধরো প্রথমটা আমিই বলে দিই – টিকিট কাটা।'

নেহা বলল, 'বুঝেছি। ...আমি বললাম, গাছ কাটা।'

নাবি বলল, 'তাহলে আমি বললাম, পুকুর কাটা।

তারপরে হলো গিয়ে...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও।' দাদু নাবিকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, 'সবাই একটা করে বলবে। আমি বললাম, পুকুরে সাঁতার কাটা।'

নেহা বলল, 'আমরা তো খাতায় দাগ কেটে খেলছিলাম। তাহলে দাগ কাটা হবে না?'

'কেন হবে না? খুব হবে!' দাদু খুশি হন, 'আবার অনেক স্মৃতি মনেও দাগ কেটে থাকে।'

নাবি বলল, 'না, না, দাদু, তুমি বলবে না। এবার আমার পালা। আমি বললাম, চুল কাটা।'

দাদু বললেন, 'তবে আমি বললাম, চুলে বিলি কাটা।'

নেহা বলল, 'আমি তো আর পাচ্ছি না।'

দাদু বললেন, 'আমরা চুল কাটি, চুলে বিলি কাটি, আর...'

'আর চুলে সিঁথি কাটি। তার মানে সিঁথি কাটা।' নেহা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে।

নাবি বলল, 'কয়েকদিন আগে বালব কেটে গিয়েছিল। এটা বলা যাবে?'

'যাবে, বলা যাবে।' দাদু উৎসাহ দেন।

'তাহলে আমি বললাম, বালব কাটা।' নাবি বলে।

দাদু বললেন, 'বৃষ্টির পর আকাশে মেঘ কেটে যায়। তার মানে মেঘ কাটা।'

নাবি বলল, 'আমি আকাশে ঘুড়ি উড়াই। সুতা কেটে ঘুড়ি হারিয়ে যায় দূরে।'

নেহা বলল, 'দাদু, নাবি আবার বলছে কেন? এবার তো আমার বলার কথা।'

দাদু বললেন, 'আচ্ছা, নাবি বলেছে সুতা কাটা। তোমারটা বলো।'

নেহা বলল, 'আমিও বলতে চেয়েছিলাম সুতা কাটা।'

'না, না। আমারটা বললে হবে না।' নাবি প্রতিবাদ করে।

'আমি বলছিলাম, চরকায় সুতা কাটা।... দাদু, আমারটা হবে না?'

'অবশ্যই হবে। এবার তবে আমি বলি, 'বিপদ কাটা।' 'বিপদের কথা শুনে আমার একটা কথা মনে হলো।' নেহা বলে, 'পরীক্ষার সময় ভুল উত্তর লিখলে স্যাররা কেটে দেয়। আর তখন রোল যায় পিছিয়ে।'

নাবি বোনের কথা শুনে হাসতে লাগল। নেহা বলল, 'এত হাসতে হবে না। এবার তোমারটা বলো।'

নাবি তবুও হাসতে লাগল। নেহা বলল, 'দাদু, দেখেছ, নাবি এখনো হাসছে। ওর হাসি দেখে মনে হচ্ছে, ওর খাতায় বুঝি ভুল হয় না!'

নাবি হাসি না থামিয়ে বলল, 'দাদু, আমি হাসছি অন্য কারণে। কারণটা হলো, আমার মাথায় আর আসছে না।'

ছোটো ভাইয়ের কথা শুনে নেহাও খুব হাসতে লাগল। খানিক বাদে হাসি থামিয়ে বলল, 'আমিও যে, দাদু, আর পারছি না।'

দাদু বললেন, 'তবে আমি আর কয়েকটা বলে চলে যাই। এই ধরো ছড়া কাটা, গানের তাল কাটা, ফোঁড়া কাটা, তরকারি কাটা...'

'ইস, তরকারি কাটা! এটা অন্তত আমাদের পারা উচিত ছিল। মা তো রোজ তরকারি কাটে।' নেহা বলল।

নাবি বলল, 'সব কাটাই তো বলা হলো, তাই না দাদু?'

দাদু বললেন, 'ভাবলে আরো কাটা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। এখনই তো আমার মাথায় কয়েকটা চলে এল।'

'কী সেগুলো?' নেহা জিজ্ঞেস করে।

'কানকাটা, ঠোঁটকাটা, নাককাটা...'

'এগুলো আবার কেমন কাটা?' নাবি থামিয়ে দেয় ভাষা-দাদুকে।

'কানকাটা মানে নির্লজ্জ। ঠোঁটকাটা মানে যার মুখে কোনো কিছু আটকায় না। নাককাটা মানে লজ্জিত হওয়া, মাথা কাটা যাওয়া মানে অপমানিত হওয়া। ...আরো কিছু পাও কিনা তোমরা দেখো। আমি যাই।' এই বলে ভাষা-দাদু উঠে পড়লেন।

ভাষা-দাদু চলে যাওয়ার খানিক বাদে নেহা বলল, 'ইস্, সময় তো ভালোই কাটল। কিন্তু দাদুর এক মাস উধাও হয়ে থাকার কারণটাই তো জানা হলো না!' ■

কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল পড়তে চাও?

মো. জিয়াউল হক জীম

এসএসসি বা এইচএসসি পড়ার সময় অনেকেই ভাবতে পারো কম্পিউটার বিজ্ঞান নিয়ে ভবিষ্যতে পড়াশুনা করবে। এ রকম ভাবনা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ভালো। কিন্তু কম্পিউটার বিজ্ঞানে ভর্তি হবার আগে একবার হলেও ভেবে নেওয়া দরকার, আমি যে এই বিষয় নিয়ে পড়ব সে বিষয়ে আসলেই আমার আগ্রহ আছে কি না! কী কী বিষয় এখানে পড়ানো হয়, সেগুলো পড়ে আমি কী করব ইত্যাদি জানা থাকলে হয়ত একটু সুবিধা হয়।

গণিত

কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল-এ গণিতের কী দরকার সেটা একদম শুরুতে আমি নিজেও বুঝিনি! কিন্তু না, এই ধরো তোমাকে একটা খুব জটিল সমস্যা দেওয়া হলো সমাধানের জন্য। এখন তুমি লজিক ধরে আগাতে থাকবে। তবে, এর আগে তোমাকে ভাবতে হবে কোন লজিকে গেলে সবচেয়ে কম সময়ে কম জটিলতায় সমস্যাটি তুমি সমাধান করতে পারবে। এটা ভাবার জন্য যেটা তোমাকে সাহায্য করবে সেটাই হলো গণিত! তোমার গণিতের দক্ষতা যতটা বেশি হবে তুমি ততটাই ভালো প্রোগ্রামার হতে পারবে।

কম্পিউটার বিজ্ঞানে মূলত ক্যালকুলাস (Calculus), লিনিয়ার অ্যালজেব্রা (Linear Algebra), সম্ভাবনা (Probability), পরিসংখ্যান (Statistics), জ্যামিতি

(Geometry) ইত্যাদি শেখানো হয়। এখন আশা যাক, 'কেন এগুলো পড়ানো হয়? এগুলো তো এসএসসি বা এইচএসসি পড়ার সময় একবার পড়েছি। আবার কেন পড়ব? আমার স্নাতক বা BSc. প্রোগ্রাম কী কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল (CSE) এর উপর, নাকি গণিত (Mathematics) এর উপর?'

ক্যালকুলাস (Calculus): জি ভাই ! অন্তরীকরণ, ব্যবকলন, সমাকলন, যোগজীকরণ আর যেন কী কী আজগুবি নাম ছিল ক্যালকুলাস বইতে। ভুলে যাও কি পড়েছিলে। ক্যালকুলাস আবার পড়ো। এবার পড়ো শেখার জন্য, পরীক্ষা পাসের জন্য নয়। ডিফারেন্সিয়াল, পারশিয়াল ডিফারেন্সিয়াল, অরডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস শিখে নাও।

লিনিয়ার অ্যালজেব্রা (Linear Algebra): হার্ট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং। ম্যাট্রিক্স এবং ভেক্টরের খেলা আছে এখানে। এমন কোনো প্রকৌশল ক্ষেত্র নাই, যেখানে এইটার প্রয়োগ নেই।

যখন তুমি তোমার ফোন অথবা ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে কোনো ছবি তুলো, ফটোশপ-এ কাজ করো, ভিডিও গেম খেলো অথবা ডিজিটাল ইফেক্ট দিয়ে মুভি দেখো, কিংবা ওয়েব সার্চ করে অথবা কাউকে ফোন করে, তুমি যে সকল প্রযুক্তি ব্যবহার করো সবকিছুই তৈরি হয়েছে লিনিয়ার অ্যালজেব্রার আদলে।

আসলে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা যে ধারণাগুলো প্রদান করে তা কম্পিউটার বিজ্ঞানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেই সঙ্গে এটির ব্যবহার রয়েছে গ্রাফিক্স, ইমেজ প্রসেসিং, ক্রিপ্টোগ্রাফি, মেশিন লার্নিং, কম্পিউটার ভিশন, অপ্টিমাইজেশান, গ্রাফ অ্যালগরিদম, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, কম্পিউটেশনাল জীববিদ্যা, তথ্য পুনরুদ্ধার এবং ওয়েব অনুসন্ধান।

নিউমেরিক্যাল মেথড (Numerical Method): গণিতে নিউমেরিক্যাল মেথড একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা এখানে এই গউস সেন্ট্রাল ইন্টারপলেশন সম্পর্কে ধারণা পাই। এটির একটি বাস্তবিক প্রয়োগ (implementation) হয় প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজে। Efficient নিউমেরিক্যাল সমাধান পাওয়ার জন্য, যেখানে ব্যবহার হয় 'নিউমেরিক্যাল মেথড', 'নিউমেরিক্যাল অ্যালগরিদম' এবং নিউমেরিক্যাল সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার প্রোগ্রাম।

সম্ভাবনা এবং পরিসংখ্যান (Probability And Statistics) : (এটা না জানলে তুমি ভুলে যাও ডাটা সায়েন্স, রোবটিক্স অথবা বর্তমান দুনিয়া কাঁপানো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে পড়ার চিন্তা)।

২-৫ বছরের মাথায় রাস্তায় নামাবে যে ড্রাইভারলেস গাড়ি, তা এর উপরেই ভিত্তি করে বানানো, এমন কী সামনের দিনগুলোর প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করেই এগিয়ে যাবে।

[কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল-এ পড়তে হলে, প্রতিটি ক্ষেত্রে গণিত একটি আবশ্যকীয় বিষয়। কিন্তু সঠিকভাবে গণিত না শেখার কারণে , অনেকের কাছে এটি হয়ে ওঠে একটি বিভীষিকার মতো।]

প্রোগ্রামিং (কোডিং) :

কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মজাদার বিষয় হলো এটি। এই প্রোগ্রামিং বা কোডিং বিষয়টা এমন যে, এটি বুঝলে পানির মতো সহজ, আর না বুঝলে তোমার কাছে হয়ে উঠবে বিভীষিকার মতো।

তুমি কেন প্রোগ্রামিং শিখবে?

তুমি প্রোগ্রামিং শিখবে নিজের কোনো একটা সমস্যা সমাধান করার জন্য। তোমার প্রাত্যহিক কাজকে স্বয়ংক্রিয় (Automated) করার জন্য বা উন্নত (Improve) করার জন্য। ভালো প্রোগ্রামার হওয়ার জন্য তোমাকে ভয়ানক ক্রিয়েটিভ হওয়ার দরকার নেই। দরকার শুধু ধৈর্য আর ব্যাপক মাথা খাটানো। একের পর এক লজিক সাজিয়ে একেকটা প্রবলেম সমাধান করা।

দীর্ঘ সময় একটা প্রবলেমে আটকে থাকা, কফির কাপে চুমুক আর প্রবলেমটি নিয়ে চিন্তা করা। চিন্তার একটা পর্যায়ে যখন সমস্যাটা সমাধান হয়ে যায়, তখন যে নির্মল সুখ আর অনাবিল আনন্দ পাওয়া যায় সেটা অনুভব করার জন্য।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা, কেউ একবার প্রোগ্রামিং -এ মজা পেয়ে গেলে আর কিছু লাগবে না। কারণ প্রোগ্রামিং একটা নেশা! হ্যাপি কোডিং।

কোন প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ শিখলে ভালো হয়, এইটা ৫ জনকে জিজ্ঞেস করলে মিনিমাম ১৫টা ডিফারেন্ট উত্তর পাওয়া যাবে। সকালে যদি বলে এইটা শিখো, রাতে বলবে ওইটা শিখো। আর গরম হালকা একটু বেশি লাগলে বলবে অন্য আরেকটা শিখো।

প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের একদম বেসিক হলো সি। তারপর আস্তে আস্তে লজিক ডেভেলপ করতে করতে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কোর্সে শিখানো হয় জাভা/সি+। যেই প্রোগ্রামিং ভাষাই শিখো না কেন সব সময় বোঝার চেষ্টা করবে যে একটি প্রোগ্রাম কীভাবে কাজ করছে। আর প্রোগ্রামিং ভাষা একটি ভালোভাবে শিখলেই বাকিগুলো শেখাও সহজ হয়ে যাবে।

অ্যাসেম্বলি ল্যাংগুয়েজ : মেমোরিতে ডেটার হিসাব কীভাবে রাখে তা এই ল্যাংগুয়েজ পড়লে বুঝা যায়। মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা খুবই কঠিন, তাই অ্যাসেম্বলি ভাষা তৈরি করা হয়েছে। অ্যাসেম্বলার দিয়ে এই অ্যাসেম্বলি ভাষাকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করা হয়। অ্যাসেম্বলার হলো একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা অ্যাসেম্বলি ভাষাকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে।

মূলত সবগুলো প্রোগ্রামিং কোর্স দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে শেখানো হয় থিউরি অন্য ভাগে ল্যাবে ব্যবহারিক। অনেক সময় থিউরি ক্লাস বোরিং লাগতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো থিউরি ভালো মতো না বুঝলে ল্যাবে গিয়ে প্রোগ্রামিং প্রবলেম সলভ করতে প্রবলেম হবে।

ডেটা স্ট্রাকচার এবং অ্যালগরিদম : বুক শেলফে তুমি অনেক বই এলোমেলো করে রেখেছ। এলোমেলো বইগুলোর মধ্য থেকে তোমার প্রয়োজনীয় বই খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। কিন্তু যদি নির্দিষ্ট কোনো স্ট্রাকচার ফলো করে বইগুলো সাজিয়ে রাখো, সেক্ষেত্রে কিন্তু বই খুঁজে পেতে তেমন কোনো কষ্ট হবে না। ডেটা স্ট্রাকচার হলো কম্পিউটারের মেমোরিতে ডেটাকে নির্দিষ্ট উপায়ে রাখা, যেন প্রয়োজনে ডেটা সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। ধাপে ধাপে একটি সমস্যা সমাধানের বিশেষ পদ্ধতি হলো অ্যালগরিদম, অর্থাৎ একটি সমস্যাকে কয়েকটি ধাপে ভেঙে প্রত্যেকটি ধাপ পরপর সমাধান করে সমগ্র সমস্যা সমাধান করাই হলো মূলত অ্যালগরিদম। মূলত একটা প্রবলেমকে সমাধান করার টেকনিকগুলোই এই কোর্সে শেখানো হয়।

পদার্থবিজ্ঞান, ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিকস

CSE=SwE+EEE

(SwE - সফটওয়্যার প্রকৌশল এক ধরনের প্রকৌশল, যেটি সফটওয়ার নকশা, উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক)

(EEE - প্রায়শ তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং নামে অভিহিত)

কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশলকে এর মূলত দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি সফটওয়্যার (Software) এবং দ্বিতীয়টি হলো হার্ডওয়্যার (Hardware)। সফটওয়ার অংশটুকু প্রোগ্রামিং (কোডিং), সফটওয়ার বা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট পার্ট। হার্ডওয়্যার পার্টে আবার বেসিক ইলেকট্রনিকস থেকে শুরু।

হার্ডওয়্যার পার্ট ছাড়া যেমন একটি কম্পিউটার কল্পনাও করা যায় না, ঠিক একই ভাবে কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশলে সফটওয়ার কোর্স এর পাশাপাশি ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিকস এর কিছু কোর্স পড়ানো হয়। আমরা সবাই জানি, ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিকস হচ্ছে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান, তাই প্রথম বর্ষে পদার্থ বিজ্ঞান থেকে কিছু কোর্স পড়ানো হয়।

‘কম্পিউটার বিজ্ঞান এর এই পার্টে ভালো করার জন্য তোমার প্রয়োজন হবে যথেষ্ট প্রাকটিস। মূলত সবগুলো ইলেকট্রনিকস কোর্স দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে শেখানো হয় থিউরি; অন্য ভাগ ল্যাবে ব্যবহারিক। থিউরি ক্লাস বোরিং লাগতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো থিউরি ভালো মতো না বুঝলে ল্যাবে গিয়ে ব্রেডবোর্ড এ সার্কিট সাজাতে প্রবলেম হবে। ইলেকট্রনিকস এ

ভালো করতে হলে বাসায়, ব্রেডবোর্ড, রেজিস্টার, মাল্টিমিটার ইত্যাদি কিনে প্রাকটিস করতে পারো।'

ইলেকট্রিক্যাল হচ্ছে বিজ্ঞানের সেই শাখা যেখানে পরিবাহীর (Conductor) ইলেকট্রনের প্রবাহ এবং পরিবাহী দ্বারা তৈরি বস্তু (যেমন- মোটর, জেনারেটর, ট্রান্সফর্মার, সুইচগিয়ার, ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টর, সার্কিট ব্রেকার ইত্যাদি) নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ইলেকট্রনিকস হচ্ছে বিজ্ঞানের সেই শাখা যেখানে অর্ধ-পরিবাহী (Semi-Conductor), অর্ধ-পরিবাহীর ভিতর দিয়ে চার্জ তথা ইলেকট্রন ও হোল- এর প্রবাহ এবং সেমিকন্ডাক্টর দ্বারা তৈরি বস্তু বা এর মতো আচরণকারী (যেমন– ইলেকট্রনিক টিউব, ভ্যাকুয়াম টিউব, ডায়োড, ট্রানজিস্টার, মসফেট, জে-ফেট, এস.সি.আর, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (আই.সি), এমপ্লিফায়ার, অসিলেটর, ফ্লিপফ্লপ, লজিকগেট, মাইক্রোকন্ট্রোলার ইত্যাদি) নিয়ে আলোচনা করা হয়।

> কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশলকে মূলত দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি সফটওয়্যার (Software) এবং দ্বিতীয়টি হলো হার্ডওয়্যার (Hardware)। সফটওয়ার অংশটুকু প্রোগ্রামিং (কোডিং), সফটওয়ার বা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট পার্ট। হার্ডওয়্যার পার্টে আবার বেসিক ইলেকট্রনিকস থেকে শুরু।

মূলত এই ভাগে ইলেকট্রনিকস ডিভাইস অ্যান্ড সার্কিটস, মাইক্রো প্রসেসর অ্যান্ড অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ, এম্বেডেড সিস্টেম ইত্যাদি শেখানো হয়।

কেন পড়বে কম্পিউটার বিজ্ঞান?

তোমার যদি আগ্রহ থাকে বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক CONTEST করার, ইচ্ছে থাকে বিভিন্ন সফটওয়্যার অথবা ওয়েবসাইট তৈরির, রোবোটিক্স (Robotics), কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligent) নিয়ে কাজ করার। একই সাথে তুমি অনেক ধৈর্যশীল, প্রোগ্রামিং এবং ইলেকট্রনিকস দুটোকে নিয়ে আগাতে চাও, অর্থাৎ ক্রিয়েটিভ বা সৃজনশীল কোনো কাজ করার ইচ্ছে থাকে তাহলে চোখ বন্ধ করে ভর্তি হয়ে যেতে পারো কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশলে।

তুমি খুবই ফুর্তিবাজ লোক। সারাদিন বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে পছন্দ করো, ঘোরাফেরা করো, তাহলে জেনে রাখো সিএসই তোমার জন্য নয়। সিএসই পড়তে হলে দেখা যাবে দুই দিন তুমি ঘর থেকেই বের হতে পারোনি। সারাদিন কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা লাগছে। তোমার মন যদি এত অস্থির হয় তবে সিএসই না পড়াই ভালো।

[একটা কথা না বললেই নয়। অনেকে হয়ত আগে থেকে সবকিছু না জেনেশুনে কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশলে ভর্তি হয়ে যায়, কিন্তু ভর্তি হওয়ার পরে প্রোগ্রামিং আর ভালো লাগে না। ভালো লাগে না ব্রেডবোর্ড-এ সার্কিট সাজাতে। সত্যি কথা হলো প্রোগ্রামিং একদিনে শিখে ফেলার বিষয় না, ইলেকট্রনিকস বিষয়টা একই রকম। প্র্যাকটিস করে করে দক্ষতা বাড়ানোর বিষয়। খুব সাধারণভাবে চিন্তা করে। তুমি যদি মনে করো একদিনে দশ পৃষ্ঠা মুখস্ত করে ফেলে পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি নাম্বার পাবে; সেটা তুমি অন্য সাবজেক্টে পেতেই পারো। কিন্তু তুমি দশটা প্রোগ্রামিং প্রবলেম মুখস্ত করতে গেলে দেখবে হয়ত পরীক্ষায় অন্য একটা প্রবলেম আসছে। সেক্ষেত্রে তো তুমি পারবে না। তুমি যদি লজিক খাটিয়ে খাটিয়ে একটা করে করে প্রবলেম সলভ করো তাহলে দেখতে পাবে প্রোগ্রামিং করার চেয়ে মজার এবং প্রোগ্রামিং-এর চেয়ে সহজ আর কিছু নেই।]

এই ছিল কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল (CSE) নিয়ে আমার কিছু কথাবার্তা। আমি কিন্তু নিজে মোটেই পড়ুয়া ছাত্র না, ভালো স্কিল আছে এমনটাও না। কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল (CSE) পড়ার আগে আমি এ রকম কোনো উপদেশ পাইনি কারো কাছ থেকে। আমি ঠেকেছি আর শিখেছি। এখনো শিখছি। তাই যারা ভার্সিটিতে কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল (CSE) পড়তে চাইছে তাদের জন্য আমার এই লেখা। ■

কবিতা

খোকার খাতা

স্বপন শর্মা

পড়তে বসে পড়ছে না সে দেখছে শুধু চেয়ে
এমন গভীর চাহনি তার, যাচ্ছে কি যে পেয়ে!
খানিক বাদে হাতের কাছে পেন্সিল খাতা নিয়ে
খাতার পাতায় কী সব করে খুব মনোযোগ দিয়ে।

খাতার পাতায় লেখার চেয়ে আঁকা-আঁকি বেশি
কোথাও আঁকে মানব দেহ কোথাও হাতের পেশি
কোথাও আবার কাঁঠাল গাছে বাদুড় ঝুলে আছে
আঁকছে পুকুর জলে ভরা সাঁতার কাটছে মাছে।

ধানের মাঠে সকল কৃষক কাটছে পাকা ধান
আঁকছে কোথাও একতারাটা গাইছে কেহ গান।
খাতার পাতায় এমন ধরন ভিন্ন রঙের ছবি
কভার পেজে আঁকল নিজে পুব আকাশের রবি।

আর্ট খাতা নয় তবু আঁকা খাতার পাতা জুড়ে
এসব দেখে বুঝা মুশকিল! মাথায় কি যে ঘুরে।
খোকার খাতায় নেই তো লেখা শুধু আঁকা-আঁকি
খাতা দেখে বলল মায়ে- ভাবনাতে রোজ থাকি।

ছড়া

ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান

নিত্য তোমরা মন ভরে দাও পড়া দিয়ে
আজকে আমি বলবো কথা ছড়া নিয়ে।
আচ্ছা বলো, পড়তে ছড়া অমত কার?
সবাই পড়? খুশির কথা! চমৎকার!

লোকে বলে, ছড়া নাকি ঘুমপাড়ানি
আমি বলি ছড়া হলো, ঘুমতাড়ানি।
তোমরা যত স্লোগান শুনো ছন্দে ছন্দে
ছড়ার তালে প্রতিবাদ নয় সর্বদ্বন্দ্বে?

'খোকন খোকন ডাক পাড়ি' এক উদাহরণ
এবার করো এই ছড়াটির সুধা বরণ।
'খোকন' হলো দেশজননীর দামাল ছেলে
দেশজননী ডেকে বলেন, কোথায় গেলে?

'দুধ মাখা ভাত' মানে হলো, স্বদেশের ধন
'কাক' মানে ওই দুষ্টু শোষক। ভরেছে মন?
'দুধ মাখা ভাত কাকে খায়' এর মানে হলো
স্বদেশের ধন শত্রুরা খায়, যুদ্ধে চল।
এবার বলো, ছড়া মানেই হয় শিশুতোষ?
বুঝতে কথা ব্যর্থ হলে ছড়ার কী দোষ?
ছড়া হলো গর্জে ওঠার মূল হাতিয়ার
বজ্রকণ্ঠে ছড়ার মতো কে সাথি আর?

আমার মাহিগঞ্জ

মৃন্ময় মুবার্‌রত

মাহিগঞ্জ আমার শান্তিনিবাস
প্রিয় জন্মভূমি,
এ মাটিতে জন্ম নিল
অনেক জ্ঞানী-গুণী।
এ মাটিতে ছিল অনেক
রাজা-মহারাজা,
শক্ত হাতে করেন শাসন
অপরাধীকে দেন সাজা।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর

সাইবার সচেতনতা

মেজবাউল হক

বন্ধুরা, ফেসবুকের সর্বোচ্চ দ্বিতীয় ব্যবহারকারীর শহর ঢাকা। তুমি-আমি-আমাদের পাশের মানুষও এখন ফেসবুক তথা ইন্টারনেটের জালে আটকা। ইন্টারনেট ব্যবহার যেমন একদিকে ইতিবাচক, অন্যদিকে প্রযুক্তিতে আসক্তি নামের নেতিবাচক সমস্যারও কারণ। যে-কোনো বয়সের মানুষই প্রযুক্তির আসক্তিতে জড়িয়ে পড়তে পারে। গবেষণায় দেখা যায়, প্রযুক্তিতে আসক্তির শুরুটা হয় মুঠোফোন দিয়ে। এটা যে আসক্তি, সেটাও ব্যবহারকারীরা বুঝতে পারে না। একটি প্রতিবেদনে জানাচ্ছে, মানুষ গড়ে প্রতি ছয় মিনিটে মুঠোফোনের পর্দায় একবার চোখ রাখে।

অন্য একটি গবেষণায় দেখা যায়, কিশোরদের ২৪ ঘণ্টা মুঠোফোন ব্যবহারের সুযোগ না দিলে তারা চরম মাত্রায় বিরক্তি প্রকাশ করে। মুঠোফোন না পাওয়ার সময়টাকে ‘একাকি’ ও ‘হতাশা’ বলে জানাচ্ছে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়েসি কিশোর-তরুণেরা। সাইকোথেরাপিস্ট ভাষ্যে, প্রযুক্তিতে আসক্তি মাদকাসক্তির মতোই। যে আসক্তি, সে কখনোই টের পায় না। সাইবার আসক্তির কারণে মানসিকভাবে অপুষ্ট মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।’

সাইবার আসক্তির কারণে নীরবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিশোরেরা। খেলছে বিপদজনক বিভিন্ন গেম। মোবাইল বা অন্যান্য ডিভাইসের প্রতি শিশু-কিশোরদের বাড়ছে প্রবল আগ্রহ। ফলে মানসিকভাবে অস্থির ও অধৈর্য, অমনোযোগিতা, খিটখিটে মেজাজ, কথা না শোনা, ইভটিজিংসহ বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়ছে অল্প বয়সেই।

এছাড়াও কিশোরদের সাইবার আসক্তির কারণে সামাজিক অস্থিরতা, পরিবারের সঙ্গে দূরত্ব, নীতি-সামাজিক দায়ের প্রতি বিরক্তি বাড়ছে । কিশোরদের মতোই তরুণ পেশাজীবীদের মধ্যেও ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্তি বাড়ছে। এতে তাদের কর্মস্পৃহা কমছে, কাজে অমনোযোগিতা বাড়ছে।

বন্ধুরা, তোমরা অবসরে ইন্টারনেটে সময় অপব্যয় না করে লেখাপড়া করতে পারো। সেই জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট। এমনই কিছু শিক্ষামূলক বাংলা ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেওয়া হলো। যেগুলো থেকে তোমরা বিভিন্ন শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক লেখাপড়া, পরীক্ষার সময় সূচি, সাজেশন, ফলাফলসহ সাধারণ জ্ঞান ও বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফল-ভর্তি পরীক্ষার সময় সূচি এবং নানা রকম বিষয়ের কোর্স, টিউটোরিয়াল প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে পারবে।

1. http://www.lekhaporabd.com
2. http://www.banglahili.com
3. http://www.edunewsbd.com
4. http://www.champs21.com
5. http://www.bbcjanala.com
6. http://www.matholympiad.org.bd
7. http://www.educatorbd.com
8. http://www.jompesh.com
9. http://www.ovidhan.org
10. http://www.bdword.com
11. http://www.educationboard.gov.bd
12. http://www.mopme.gov.bd
13. http://www.shikkhok.com
14. http://www.khanacademybangla.com
15. http://www.teachers.gov.bd
16. http://www.bangladeshcouncil.com
17. http://www.eduicon.com
18. http://www.varsity.com.bd
19. http://www.onlinecoaching.com.bd
20. http://www.srijonshil.com
21. http://www.educarnival.com
22. http://www.studybd.com
23. http://www.studentcarebd.com
24. http://www.britishcouncil.com

প্রযুক্তি ব্যবহারে মানতে পারো কিছু নিয়মকানুন

রাতে ঘুমানোর আগে বিছানা থেকে মুঠোফোন দূরে রাখা, সকালে ঘুম থেকে উঠে ২–৩ ঘণ্টা আগে ফোন কিংবা ল্যাপটপের সামনে না বসা, ফেসবুক ব্যবহার সীমিত করা, পত্রিকা আর বইপড়ার পুরোনো অভ্যাস ফিরিয়ে আনা, ক্লাসে বা বাসায় পড়ার সময় মুঠোফোন এড়িয়ে চলা, ইন্টারনেটের প্রয়োজনীয়তার দিকটা বেশি করে জানা, বিভিন্ন শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট ও টুলস ব্যবহারে মনোযোগী হওয়া প্রভৃতি।

নিবন্ধ

রংধনু খাবারের গল্প

শাহিদা সুলতানা

ছোট্ট বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আমরা একটু খাবারের গল্প করি, কি বলো? খাবার খেতে ভালোবাসোনা এমন কেউ আছো? তোমাদের কি সেই বুদ্ধিমান খরগোশের গল্পটা মনে আছে যে বিপদে পড়ে গাজর, পালং শাক এদের কাছে বুদ্ধি চেয়েছিল? কীভাবে সে দুষ্টু সিংহকে কুয়োতে ফেলে দিয়ে নিজের জীবন বাঁচিয়েছিল? কি আছে গাজর, পালং শাকে এবং অন্যান্য ফল-সবজি, মাছ, মাংসে আজ আমরা সেই গল্পই করবো।

তোমরা জানো, খাদ্য শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে-কোনো কাজের জন্য তুমি শক্তি পাও খাদ্য থেকে। তুমি প্রতিদিন সুস্থভাবে বেড়ে উঠছো খাবারের জন্য। মটরশুটি জাতীয় খাবার শরীরের বৃদ্ধি ও গঠনে সাহায্য করে, সবজি এবং ফলমূল প্রধানত শরীরের অসুস্থতা থেকে সুরক্ষা দেয়। প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের খাবার খেতে হয় এবং প্রচুর পরিমাণ পানি পান করতে হয়।

তোমরা কি রংধনুর সাতটি রঙের নাম জানো? বেগুনি, নীল, আকাশি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল (বেনিআসহকলা) এই রংগুলো নিয়েই বৃষ্টি শেষে রংধনু আকাশে দেখা যায়। তোমরা কি কখনো রংধনু রঙের খাবার খেয়েছ? চলো তো দেখে নেই রংধনু খাবার কোথায় পাওয়া যায়? ফল-সবজির রঙের সাথে খাবারের গুণেরও পার্থক্য হয়।

কমলা ও লাল

রংধনুর অন্যতম দুটি রং হলো কমলা ও লাল। কমলা রঙের সবজি যেমন - গাজর, মিষ্টি কুমড়া, মিষ্টি আলু, স্কোয়াশ এগুলোতে আছে বিটাকেরোটিন। যা শরীরে প্রবেশের পর ভিটামিন এ তে পরিণত হয়। এবার বলো ভিটামিন এ কি কাজ করে? এটি শরীরকে রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি দেয়, হাড় গঠনে সাহায্য করে, যার কারণে তুমি সুস্থ থাকতে পারো। ভিটামিন এ, লিউটিন এবং জিয়াজেনথিন নামের দুটি উপাদান তোমার চোখ ভালো রাখে। লাল রঙের সবজিতে আছে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি। লাল রঙের কোন সবজি এবং ফল তোমার পছন্দ বলো তো? টমেটো, তরমুজ, স্ট্রবেরি খেতে নিশ্চই তোমার ভালো লাগে। লাল রঙের আরো যে সব খাবার খাওয়ার প্রয়োজন। চলো একবার দেখে নেই– আপেল, চেরি, আঙুর, লাল পেঁয়াজ, ডালিম, বিট্স, লাল মরিচ ইত্যাদি।

কমলা ও হলুদ

কমলা ও হলুদ ফল এবং সবজি রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে, হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, চোখ ভালো রাখে। এতে আছে ভিটামিন সি এবং বিটাকেরোটিন,যা শরীরে ভিটামিন এ তে পরিণত হয় এবং চোখ ভালো রাখতে সাহায্য করে।

দেখ তো ছবিতে তোমার পছন্দের সবজি এবং ফল আছে কিনা ? পেলে আমাকে জানিও কিন্তু। কমলা, আঙুর, লেবু, আম, পেঁপে, গাজর, মিষ্টি আলু, ভুট্টা, হলুদ ও কমলা, ক্যাপসিকাম, আনারস ইত্যাদি ফল এবং সবজি তোমাকে সাহায্য করে।

সবুজ

লাল, হলুদ, কমলা তো হলো, বলতো আর কী রং আছে রংধনুতে? আর একটি অন্যতম রং হলো সবুজ। সবুজ কার কার পছন্দের রং হাত তোলো তো দেখি! বাহ্! খুব ভালো। এসো দেখিত সবুজ রঙের খাবারে কী গুণ আছে? সবুজ রঙের ফল এবং সবজি তোমার শরীরে জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমাকে সুস্থ রাখে, ক্ষতিকর উপাদান শরীর থেকে বের করে দেয়, তোমাকে অনেক অনেক পড়াশোনা, খেলাধুলা করার শক্তি দেয়। তোমার শরীরে রক্ত এবং হাড় ভালো রাখার জন্য কাজ করে সবুজ রঙের খাবার। বিভিন্ন সবুজ শাক, ব্রকলি, লেটুস, সবুজ আঙুর, সবুজ আপেল, মটরশুটি, বাঁধাকপি, শিম ইত্যাদি খাবার খেলে তোমার জীবনীশক্তি বেড়ে যাবে অনেক অনেক গুণ। আগামী দিন জানাবো আরো রঙের খাবারের নাম। সেই পর্যন্ত সুস্থ থেকো, রঙিন থেকো তোমরা সব্বাই...। ■

পাচার প্রতিবাদ

নাসির ফরহাদ

দুপুরে পুকুরে যাস না ও খুকুরে
ওপাড়ায় দলবাঁধে বেজাতীয় কুকুরে।
ছেলে ধরা বদ লোক
ওদের খারাপ চোখ,
কথা শোন বড়োদের সোনা জাদু দুখুরে।

ইশকুলে টিফিনে কারো হাতে খাবি না
পরিচয়হীন লোকে দুটাকাও চাবি না।
ভালো সেজে বাবা ডেকে
শপিংয়ের ব্যাগে ঢেকে,
পাচার তো হয়ে যাবি কোনো পার পাবি না।

বাইরে যাবি যদি বাড়ি থেকে বলে যা
ভালো ছেলে হয়ে খোকা ভালোদের দলে যা।
রাগ জেদ ভালো না
মনে আলো জ্বালো না?
ছেলেধরা পাচারীকে পায়ে পায়ে ডলে যা।

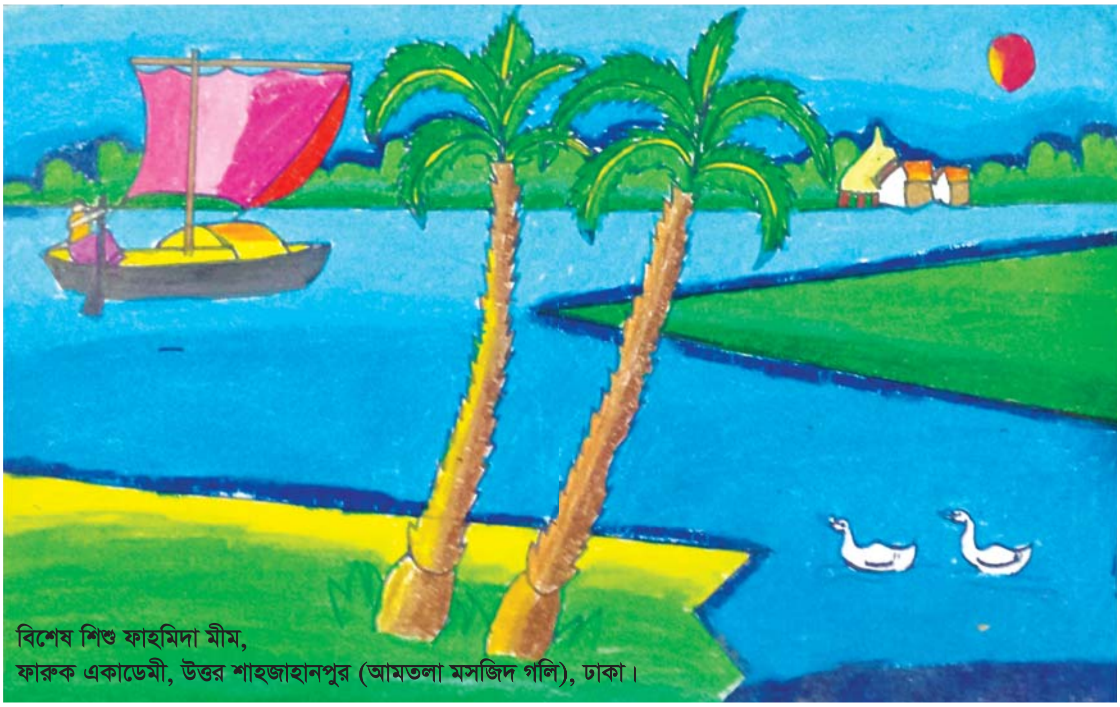

বিশেষ শিশু ফাহমিদা মীম,
ফারুক একাডেমী, উত্তর শাহজাহানপুর (আমতলা মসজিদ গলি), ঢাকা।

স্বাস্থ্য
কথা

শিশুদের বাতের ব্যথায় অকুপেশনাল থেরাপি

রাবেয়া ফেরদৌস

মারুফ বাবা-মার একমাত্র আদরের সন্তান। ওর বয়স ১২ বছর। এক সপ্তাহ ধরে মারুফের শরীরের জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা। কিছুতেই ব্যথা কমছেনা। মারুফকে নিয়ে ওর বাবা-মার চিন্তার শেষ নেই। মা প্রথমে একটি মলম দিয়ে ম্যাসাজ করলো। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। দুই দিন এভাবেই কাটলো। তৃতীয় দিন মারুফকে নিয়ে মারুফের বাবা-মা গেল একজন অর্থোপেডিক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার বললেন, এতে ভয়ের কিছুই নেই । সমস্যাটি বয়ঃসন্ধি কালে যে-কোনো ছেলে-মেয়েরই হতে পারে। এ নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ডাক্তার মারুফকে কিছু ওষুধ লিখে দিলো এবং এই অবস্থায় ব্যথামুক্তভাবে তার দৈনন্দিন কাজগুলো কীভাবে করবে সেটির চিকিৎসার ব্যাপারে অকুপেশনাল থেরাপিস্টের পরামর্শ নিতে বলেন।

মারুফের মতো এই সমস্যা নিয়ে ভোগে অনেক কিশোর-কিশোরী। ৭- ১২ বছর বয়সি শিশুদের এটা বেশি হয়। ১৬ বছর বয়সের আগে এ ধরনের ব্যথার কারণ খুঁজে না পেলে তাকে জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আর্থ্রাইটিস বলা হয়।

শিশুদের বাতের ব্যথায় যে লক্ষণগুলো সাধারণত দেখা যায় সেগুলো হলো—

-জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা, বিশেষ করে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে ব্যথার পরিমাণ বেশি থাকে।

-জয়েন্ট ফুলে যাওয়া। সাধারণত বড়ো জয়েন্ট যেমন- হাঁটুর জয়েন্ট ফুলে যায়।

-চলাফেরা করার সময় জয়েন্ট শক্ত হয়ে যাওয়া। এ সমস্যাটিও সকালের দিকে বেশি হয়।

এছাড়াও শিশুদের বাতের ব্যথা হলে জ্বর, লিম্ফনোড ফুলে যাওয়াসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে পিঠের দিকে র‍্যাশ উঠতে পারে।

শহুরে শিশুরা খেলাধুলা কম করে। যার ফলে তাদের শারীরিক পরিশ্রম কম হয়। সূর্যের রোদের অভাব আর অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে ভিটামিন ডি-এর অভাব হয়। এতে শিশুর পেশি ও হাড়ে ব্যথা হতে পারে। কম্পিউটার, মুঠোফোন, ল্যাপটপ ইত্যাদি বেশি ব্যবহারের কারণে ঘাড়, কোমর বা শরীরে ব্যথা হতে পারে।

মারুফের বাব-মা ডাক্তারের পরামর্শে একজন অকুপেশনাল থেরাপিস্টের শরণাপন্ন হলেন। অকুপেশনাল থেরাপিস্ট বললেন, দৈনন্দিন কাজগুলো কিছু নিয়ম মেনে করলেই এ সমস্যা থেকে খুব সহজেই পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। এছাড়াও নিয়মিত খেলাধুলা, সাইকেল চালানো, দৌড়াদৌড়ি ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস শিশুদের সুস্থ হাড় ও সন্ধি গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

অকুপেশনাল থেরাপিস্ট প্রথমে মারুফকে পর্যবেক্ষণ

(অ্যাসেসমেন্ট) করেন। পর্যবেক্ষণ করে জানতে পারলেন, মারুফ দীর্ঘক্ষণ কম্পিটারে গেইম্স খেলে। যে কারণে দীর্ঘক্ষণ একই অবস্থায় থাকার কারণে তার পিঠ, হাঁটু, ঘাড় ও হাতে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে।

মারুফের জন্য অকুপেশনাল থেরাপিস্টের পরামর্শগুলো হলো—

- শরীরের সঠিক অবস্থান মেনে অকুপেশনাল থেরাপিস্টের দেখানো নিয়ম অনুযায়ী কম্পিউটার/ ল্যাপটপ ব্যবহার করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই কম্পিউটার, ল্যাপটপ বা মোবাইল ফোন দীর্ঘক্ষণ ব্যবহার করা যাবে না।
- এছাড়াও ইলেকট্রনিক গেজেটগুলো বিছানায় শুয়ে ব্যবহার করা যাবে না। এতে করে ঘাড়, পিঠ এবং হাতে ব্যথা বেড়ে যেতে পারে।
- যে-কোনো কাজ করতে গিয়ে যখনই সে তীব্র ব্যথা অনুভূত করবে তখনই সেই কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- একটানা কাজ না করে বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে কাজ করতে হবে। কেননা বিশ্রাম নিয়ে কাজটি করলে সহজ হয়।
- যে-কোনো কাজ করার সময় বড়ো বড়ো জয়েন্টের ব্যবহার করতে হবে বেশি। যেমন—স্কুলের ব্যাগ নেওয়ার সময় ব্যাগটি হাতে বহন না করে কাঁধে বহন করলে আরাম পাওয়া যায় বেশি।
- একই অবস্থায় ২০ মিনিটের বেশি থাকা ঠিক হবে না। যেমন—চেয়ারে বসে পড়াশুনা করার সময় ২০ মিনিট পর উঠে দাঁড়িয়ে পড়াটি পড়তে হবে অথবা হাঁটাহাঁটি করতে হবে। একইভাবে দাঁড়ানো থাকলে ২০ মিনিট পর বসে বিশ্রাম নিতে হবে।
- চেয়ার-টেবিলে পড়ালেখার সময় শরীর টেবিলের কাছাকাছি এনে পড়তে হবে তাতে করে ঘাড় এবং পিঠ সোজা থাকবে।

তবে প্রতিটি শিশুর লক্ষণ অনুযায়ী অকুপেশনাল থেরাপি চিকিৎসা বা পরামর্শগুলো ভিন্ন হবে। এক্ষেত্রে দৈনন্দিন কাজগুলো শরীরের সঠিক অবস্থান অনুযায়ী করার জন্য প্রতিটি মানুষের উচিত একজন অকুপেশনাল থেরাপিস্টের পরামর্শ নেওয়া।

মারুফের মতো এরকম শিশু প্রতি ঘরে ঘরে রয়েছে। তাই শিশুদের ইলেকট্রনিক গেজেট থেকে দূরে রেখে তাদের খেলাধুলার প্রতি মনোযোগ বাড়াতে হবে। সরকার এবং এলাকাবাসীর উদ্যোগে প্রতিটি এলাকাতে একটি করে খেলার মাঠ তৈরি করতে হবে। এতে করে শিশুদের টেলিভিশন, মোবাইল, কম্পিউটারের প্রতি আসক্তি কমে যাবে এবং তাদের মেধার বিকাশ হবে। ■

কিশোর বেলা

নাসিরুদ্দীন তুসী

খোঁপার কালো ফুলদানিটা গোলাপ কলির লালে
হৃদয় তোমার রঙিন করে লাজুক কিশোর কালে
যায় না বলা কারো কাছে
শিস দিয়ে যায় দোয়েল নাচে
মনের কোকিল কুহুকুহু কৃষ্ণচূড়ার ডালে।

একটুখানি আঘাত পেলে কুঁকড়ে ওঠে মন
একটুখানি ভালোবাসায় সুখের আয়োজন
একটু ভুলে অনেক গ্লানি
উছলে পড়ে চোখের পানি
হ্যামিলনের বাঁশিঅলা ডাকে সারাক্ষণ।

মন হারাবার দিন এসেছে, ঘুম হারানো রাতে
কে যে ডাকে, অচেনা কেউ; অচিন ইশারাতে
সকাল-দুপুর-বিকেল সাঁঝে
মন বসে না কোনো কাজে
যাকে খোঁজ হয় না বুঝি দেখা তাহার সাথে।

হৃদয় নিয়ে কান্নাহাসি, হৃদয় নিয়ে খেলা
বুকের ভেতর কতই ব্যথা, অথই সুখের মেলা
এই তো সময় বাঁধন ছেঁড়া
সুখ-অসুখের স্বপ্নঘেরা
তোমায় যেন কেউ বোঝে না, হায়রে কিশোর বেলা!

কবিতায় বর্ষা

বরষার জলে

শরীফ আব্দুল হাই

গুরুগুরু মেঘ ডাকে
আকাশের তলে
নদীনালা ভরে ওঠে
বরষার জলে।
কালো মেঘে কানাকানি
কী যে কথা বলে
নদীনালা ভরে ওঠে
বরষার জলে।
রিনিঝিনি শব্দটা
একটানা চলে
নদীনালা ভরে ওঠে
বরষার জলে।
বিজুলির হাসি ফোটে
ছলনার ছলে
নদীনালা ভরে ওঠে
বরষার জলে।
ভরা জলে খেলা করে
ডাহুকের দলে
নদীনালা ভরে ওঠে
বরষার জলে।

বর্ষা

মো. শাবাব হোসেন

বর্ষায় নীল আকাশ
মেঘে হয়ে যায় কালো
মেঘ থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টি
আমার দেখতে লাগে ভালো।
দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে
বৃষ্টি যখন ছুঁয়ে দেই
এত খুশি হই যে আমি
অন্য কিছু বলার নেই।

৭ম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।

নীল দেশে ওরা পাঁচ জন

মমতাজ বেগম

ওরা তিন জন একসাথে পড়ে ক্লাস এইটে। সেঁজুতী, ঈসান আর স্বপ্ন। তিন বন্ধুর খুব ভাব। যা ই করুক না কেন তিন জন সব সময় একসাথে করে।

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ওরা তিন বন্ধু ঠিক করল নৌকা ভ্রমণে যাবে। একটা নৌকা ভাড়া করল ওরা। তৈরি খাবার প্যাকেটে নিয়ে যাবে। বারোটায় যেখানে পৌঁছাবে সেখানেই নেমে কোনো গাছের নিচে বসে দুপুরের খাবার খাবে তারপর আবার ফিরতে শুরু করবে।

ওরা ছোটো, তাই ওদের কারোরই মোবাইল ফোন বা ক্যামেরা নেই। তাই ঠিক হলো সেঁজুতী ওর ছোটো চাচাকে যেভাবেই হোক রাজি করাবে ওদের সাথে যেতে।

সেঁজুতীর ছোটো চাচা ইতালি থাকেন। সপ্তাহ খানিক হলো তিনি এসেছেন সেঁজুতীদের বাড়িতে। ছোটো চাচা এখনো বিয়ে টিয়ে কিছু করেননি। খুবই মজার লোক। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হলো ছোটো চাচার ক্যামেরা আর মোবাইল ফোন দুটোই আছে। সুতরাং যে-কোনো ভাবেই হোকনা কেন চাচাকে রাজি করাতে হবে ওদের সাথে যাওয়ার জন্যে।

ছোটো চাচাতো খুবই মজার লোক, তাই ছোটো চাচাকে রাজি করাতে একটুও বেগ পেতে হলো না।

ওরা খাবার আর বিছিয়ে বসার জন্যে একটা চাদর নিয়ে খুব ভোরেই পৌঁছে গেল নদীর ধারে। নৌকা আর মাঝি রেডিই ছিল। ওরা চার জন উঠে পড়ল নৌকায়।

ছোটো চাচার গল্প শুনতে শুনতে আর হইচই করতে করতে যাচ্ছিল ওরা। হঠাৎ খেয়াল হলো দুপুর হয়ে গিয়েছে। ওরা দুই পাড়ে খোঁজ করতে থাকল, কোথায় বসা যায়। হঠাৎ একটা জায়গা দেখে সকলে একসাথে বলে উঠল, 'মাঝি এই খানে নৌকা ভীড়াও'। মাঝি ওদের কথা শুনে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে পাড়ের দিকে যাবে ঠিক করল। কিন্তু মাঝি কিছুতেই নৌকার মুখ ঘুরাতে পারল না। এত সহজে ভয় পাওয়ার পাত্র ওরা নয়। কিন্তু বিস্মিত হয়ে দেখল নৌকাটা মাঝির সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে তীরের মতো সামনে ছুটে যাচ্ছে। হঠাৎ ওরা দেখল বিশাল বড়ো একটা জন্তু, হাঁ করে আছে। আর দেখতে দেখতেই ওদের নৌকাটা সেই হাঁ-এর ভেতরে ঢুকে পড়ল। চিৎকার করে এক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করল ওরা কিন্তু তারপরই মনে হলো নৌকাটা পানিতে ভাসছে না গড়িয়ে চলছে গাড়ির মতন। নিশ্ছিদ্র কালো অন্ধকার।

এবার কিন্তু ওরা সত্যি সত্যি ভয় পেল। কিছুক্ষণ চলার পর ওরা আলো দেখতে পেল। নীল রঙের আলো। সেই আলোতে ওরা দেখতে পেল দুই পাশে অসংখ্য গাছপালা, ফুল, পাখি। কিন্তু সবচাইতে অদ্ভুত ব্যাপার হলো সব গাছগুলোর রং-ই নীল। আর সব ফুল আর পাখির রং লাল। এমনকি যে পথ দিয়ে নৌকাটা যাচ্ছিল সে পথটাও নীল। কিছুক্ষণ চলার পর থেমে পড়ল নৌকাটা।

ওরা একটু ভয়ে ভয়েই নামল নৌকা থেকে। মাঝিসহ ওরা পাঁচ জন হেঁটে সামনে এগুতে লাগল। খুব খিদে পেল ওদের। ওরা একটা জায়গা খুঁজে খেতে বসল। হঠাৎ ওরা দেখল একটু দূরে খুব লড়াই হচ্ছে। তাড়াহুড়ো করে খাওয়া শেষ করে যেখানে লড়াই লেগেছে সেখানে গেল ওরা। কার সাথে যে কার যুদ্ধ বোঝা যাচ্ছে না। অনেকগুলো মানুষও আছে আবার বাঘ, সিংহ, মোষও আছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো সবার গায়ের রং নীল।

হঠাৎ একটা বাঘ ওদেরকে দেখতে পেল। সে তখন চিৎকার করে কী যেন বলল। আর সাথে সাথে যুদ্ধ থেমে গেল। সকলে একসাথে ঘুরে দাঁড়াল ওদের পাঁচ জনের টিমের দিকে। তারপর ভয়ে ভয়ে ওদের কাছে এগিয়ে এল। ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, কে হে তোমরা? এমন উদ্ভট জন্তু। এমন রং তো আমরা কখনো দেখিনি।'

সেঁজুতী এগিয়ে গিয়ে বলল, আমরা মানুষ, নৌকা ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম, তোমাদের অদ্ভুত এই দেশটা আমাদের গিলে ফেলেছে। এখন আমরা বাড়ি ফিরবো কি করে? আমাদের মা-বাবারা কত চিন্তা করছে। তা তোমরা মারামারি করছিলে কেন?

ওরা বলল, আমরা মারামারি করিনি তো ! কয়েকটা মাছি এসে আমাদের খুব জালাচ্ছিল, আমরা সবাই মিলে তাদেরকে মারতে চাচ্ছিলাম।

আর তখনই ভোঁ ভোঁ শব্দ করতে করতে কতগুলো নীল রঙের মাছি উড়ে এল। আর এসেই হুংকার দিলো,' তোরা কে হে মোড়ল এলি?

ঈসান তখন রেগে বলল, তা তোমরাই বা ওদের বিরক্ত করছ কেন?

ঈসানের খুব পোকামাকড়ের ভয়, তাই সে ব্যাগে একটা অ্যারোসল নিয়ে বেরিয়েছিল। ঝট করে সেটা বের করে একটা মাছির উপর স্প্রে করে দিলো। টপ করে মরে পড়ে গেল মাছিটা। অন্য মাছিগুলো তখন ভয় পেয়ে উড়ে পালালো। তাই দেখে নীল দেশের বাসিন্দারা তো মহাখুশি। তারা নাচতে নাচতে তাদের নিয়ে চলল ওদের রাজার কাছে।

অনেক দূর পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে তখন ওরা রাজার কাছে পৌঁছালো। নীল দেশের নীল রঙের রাজা তো সিংহাসনে বসে। পাশে নীল রানি। কী তাদের সাজগোজের বাহার। নীল রঙের বড়ো বড়ো পাতা আর লাল ফুল লতায় গেঁথে তৈরি করা পোশাক তাদের পরনে।

নীল বাসিন্দারা সবাই রাজাকে কুর্নিশ করল। বাঘ, সিংহ, মোষ সবাই কুর্নিশ করল রাজা-রানিকে। তাই দেখে ছোটো চাচা সবাইকে ইশারা করলেন রাজাকে

কুর্নিশ করার জন্যে। ওরা সকলে মাথা নিচু করে কুর্নিশ করল রাজা-রানিকে।

নীলরা সকলে মিলে সব ঘটনা রাজাকে বলল। সাথে এটাও বলল, রাজা যেন এই শক্তিশালী অতিথিদের নিজের দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দেন। রাজা ঘাড় নেড়ে বললেন,'আজ সূর্যদেব আসবেন, তার কাছ থেকে আগে অনুমতি নিই। সূর্যদেব যে কেন ওদের ধরে এনেছেন তাতো আমি জানি না। ততক্ষণ তোমরা আমাদের দেশটা ঘুরে দেখো।

ওরা জিজ্ঞাসা করল সূর্যদেব কে?

রাজা বললেন সূর্যদেব হলো আমাদের একমাত্র দেবতা। প্রত্যেক বছর একবার করে তিনি আমাদের কাছে আসেন। এই নীল দেশে এক বছরের জন্যে আলো ছড়িয়ে দিয়ে যান। এই যে দেখছ না আমাদের পাতা, গাছ, ফুল সব কিছু থেকে আলো বেরোয়। আর আমরা সেই আলোতেই তো সবকিছু দেখতে পাই। এ আলো তো সূর্যদেব এক বছরের জন্যে দিয়ে যান আমাদের।

ওরা তখন বলল, তা আজই বুঝি বছরের সেই সূর্যদেব আসার দিন?

রাজা বললেন, 'হ্যাঁ, আজই সেই দিন। আজই আমাদের জমা আলো শেষ হয়ে যাবে। আর সূর্যদেব আবার নতুন করে আলো দেবেন।'

তখন ভয় পেয়ে স্বপ্ন বলল, তো যদি আমরা আগামীকাল তোমাদের দেশে আসতাম তাহলে তোমরা আমাদের এখান থেকে যেতে দিতে না?

রাজা দুখি দুখি মুখ করে বললেন, 'তোমরা আমাদের বন্ধু। আমরা তোমাদের ক্ষতি চাই না। কিন্তু কী করলো বল, আমার যে সে ক্ষমতা নেই যে তোমাদের ছেড়ে দিই।'

খুবই ভয় পেয়ে গেল ওরা আর মাঝি তো কাঁদতেই শুরু করল। সেঁজুতী বলল, সূর্যদেব আসুক। দেখি কী হয়। একটু এলোপাতাড়ি ঘুরে বেড়ালো ওরা। দেখল এখানে পশুপাখি, মানুষ সব একসাথে মিলে মিশে থাকে। আর সবকিছুর ভেতর দিয়েই আলো বেরুচ্ছে। অবাক হয়ে ভাবল সূর্যদেব যদি না আসে তাহলে আর একদিন পরই সব অন্ধকার হয়ে যাবে। হঠাৎ মনে হলো সবাই যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। চারিদিকে চোখ ধাঁধানো আলোয় ভরে গেল। মানুষ জীবজন্তু এমনকি পাখিরা পর্যন্ত সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল মাথা নিচু করে হাত জোড় করে। রাজা ঈসানদেরকেও বললেন ওদের অনুসরণ করতে। না হলে সূর্যদেব রেগে যাবেন। তখন ওদের মুক্তির আর কোনো সম্ভবনাই থাকবে না। সুতরাং দেখাদেখি একইভাবে বসে পড়ল ওরা।

হলুদ রঙের বিশাল একটা গোলাকার পিণ্ড এসে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলো। তারপরও কিছুক্ষণ একইভাবে বসে রইল সকলে। একটা আওয়াজ হলো। মনে হলো যেন কেউ বলল, 'সকলে উঠে দাঁড়াও।'

সকলে উঠে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল। ঈসানরা অবাক হয়ে দেখল আরে এতো আমাদের সূর্যই। হলুদ রঙের গোল একটা বড়ো আলোর মতো। তার ভেতর থেকে হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে আছে সূর্য মামা। আর চারিদিক মিষ্টি রোদে ভরে গিয়েছে। ওরা তাকিয়ে রইল সূর্য মামার দিকে।

রাজা আর রানি সূর্য মামার সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর মাথা নিচু করে কুর্নিশ করল। হাসিমুখে সূর্য মামা অর্থাৎ এদের সূর্যদেব রাজার সারা বছরের দেওয়া বর্ণনা শুনলেন। একদম শেষে রাজা ঈসানদের দেখিয়ে বললেন, 'এরা বড়ো ভালো , ভুল করে ঢুকে পড়েছে আমাদের দেশে। এদের মা-বাবারা বড়ো দুশ্চিন্তা করছে। ওদেরকে যদি সূর্যদেবের দয়া হয় তাহলে ছেড়ে দেওয়া হোক।'

সূর্য মামা ওদের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'বড়ো বেশি খলবল করছিলি তোরা নৌকার মধ্যে। দেখে ভারি রাগ হলো। মনে হলো রাখি বন্দি করে এক বছরের জন্যে। এখন তোরা কী বলিস ?

ভ্যা করে কেঁদে ফেলল সকলে একসাথে, এমনকি অতি সাহসী ছোটো চাচা পর্যন্ত। ছোটো চাচা কেঁদে বললেন 'আমার ছুটি শেষ হয়ে গেলে আমার চাকরি চলে যাবে।'

মাঝি ফুঁপিয়ে কেঁদে বলল,' হুজুর আমার ছেলে-মেয়ে সব না খেয়ে মরে যাবে।'

আর ঈসানরা তিন জন তো কান্নার জন্যে কিছু বলতেই

পারল না। জোরে জোরে কাঁদতে লাগল ওরা।

সূর্য মামা তখন ধমক দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, কান্না থামা। আমি ফেরত পাঠাচ্ছি তোদেরকে। বলার সাথে সাথেই আলোর ঝলকানিতে চোখ অন্ধকার হয়ে গেল ওদের। একটু পরে যেই চোখ খুলল, দেখল নদীতে নৌকার উপর ওরা শুয়ে আছে।

এক ঝটকায় উঠে বসল সবাই। চোখ কচলে সেঁজুতী বলল, কী ব্যাপার, আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম?

ছোটো চাচা, মাঝি, ঈসান,স্বপ্ন সকলে একসাথে বলে উঠল, আমরাও কি স্বপ্ন দেখছিলাম? একটা নীল দেশ অবাক কাণ্ড, তাহলে সকলে একসাথে একই স্বপ্ন দেখা কী করে সম্ভব ?

ঘাটে নৌকা ভিড়তেই হইহই করে সব মা-বাবাসহ আরো অনেকে ছুটে এল। সেঁজুতীর বাবাতো ছোটো চাচাকে কষে একটা ধমক দিলেন, কেমন আক্কেল তোদের। তিন দিন ধরে নিখোঁজ। ডুবুরিরা সমস্ত নদী চষে ফেলেছে। কোথাও তোদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ছোটো চাচা কৌতুকপূর্ণ হাসি দিয়ে ঈসানের দিকে তাকাতেই ঈসান চোখ টিপে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে রাখল। ছোটো চাচা চেপে গেলেন। আর পাঁচ জনই কৌতুকপূর্ণ বিজয়ের হাসি নিয়ে প্রত্যেকের সাথে চোখ মেলালো, তাহলে সত্যি সত্যিই ওরা নীল দেশে গিয়েছিল আর সূয্যি মামার সাথে কথাও বলেছে। ■

বৃষ্টির ফোঁটা

মেসকাউল জান্নাত বিথি

আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা
অঝোর ধারায় ঝরে
টুপটাপ বৃষ্টির শব্দে
মনটা কেমন করে।

বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিল
আমার নুপূর পায়ে
হাত বাড়িয়ে মাখিয়ে দিলাম
আমার সারা গায়ে।

৮ম শ্রেণি, খিলগাঁও মডেল স্কুল, ঢাকা।

মোদের দেশ

সিরাজ সালেহীন

কোন দেশেতে বটের ছায়ায়
রাখাল বাজায় বাঁশি
শস্যশ্যামল সবুজ মাঠে
কিষাণের মুখে হাসি
তপ্ত দুপুর ডাহুক ডাকে
মাঝি গায় গান
শাপলা ফোটে বিলে-ঝিলে
মন করে আনচান
এই তো মোদের বাংলাদেশ
আমরা ভালোবাসি।

৯ম শ্রেণি, মতিঝিল মডেল স্কুল

নিবন্ধ

নিজের বাল্যবিবাহ নিজেই ঠেকাচ্ছে

জান্নাতে রোজী

বাংলাদেশের কিশোরী মেয়েরা আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি সাহসী। অনেক বেশি সচেতন, অনেক বেশি অগ্রগামী। মেয়েরা এখন নিজেরাই জানে তাদের অধিকার আদায় করতে হলে প্রথমে লেখাপড়া শিখতে হবে। আর লেখাপড়া শিখতে হলে বাল্যবিবাহের শিকল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। তাই তো দেশের প্রতিটি এলাকায় চলছে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে 'লালকার্ড' প্রদর্শন, চলছে বাল্যবিবাহকে 'না বলুন' স্লোগান। প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় মেয়েরা নিজেরাই ঠেকিয়ে দিচ্ছে নিজেদের বাল্যবিবাহ। পাশাপাশি চলছে অভিভাবকদের বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলার কার্যক্রম।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বলছে, মেয়েদের নিজেদের বাল্যবিবাহ বন্ধ করার হার বাড়ছে। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে অন্তত ৩৬টি বিয়ে ঠেকিয়েছে মেয়েরা। একটি দৈনিক পত্রিকায় এপ্রিল ২০১৯ মাসেই অন্তত ১০টি বিয়ে ঠেকিয়ে দেওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছে। ময়মনসিংহের নান্দাইলে 'ঘাসফুল' সংগঠনের মেয়েরা সম্প্রতি চারটি বিয়ে বন্ধ করেছে। কলসিন্দুরের ফুটবল দলের মেয়েরাও এ কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে, এলাকায় অনেক বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছে তারা। ময়মনসিংহের ত্রিশালের সপ্তম শ্রেণির মাদ্রাসা ছাত্রী সোনিয়া আক্তার নিজের বাল্যবিবাহ নিজেই ঠেকিয়েছে। এখন সে নিয়মিত ক্লাসও করছে। সোনিয়ার মতো আরো অনেক কিশোরী আছে যারা নিজেরা নিজেদের বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছে, এ ব্যাপারে প্রশাসনও অনেক বেশি তৎপর হয়েছে।

মেয়েদের এ সচেতনতার কারণ স্কুলে এখন বাল্যবিবাহের কুফল, উত্ত্যক্তকরণ, প্রজনন স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতনতামূলক পাঠদান করা হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সারাদেশে কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন করে দেওয়া হয়েছে। যার প্রধান উদ্দেশ্য মেয়েদের নিজেদেরই এজেন্ট বানানো, যাতে তারা নিজেরাই বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিকসহ বিভিন্ন বিষয় অভিভাবকে বোঝাতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি সংগঠনও বাল্যবিবাহ ঠেকাতে নানা সচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

স্মরণযোগ্য, ২০১৬ সালে ঝালকাঠির কিশোরী শারমিন আক্তার মায়ের বিরুদ্ধে মামলা করে নিজের বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছিল। সেজন্য সে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের 'ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অব কারেজ ২০১৭' পুরস্কার পায়।

এছাড়া সহপাঠীর বাল্যবিবাহ বন্ধ করায় স্থানীয় প্রশাসন সুনামগঞ্জের ধরমপাল উপজেলার মধ্যনগর পাবলিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৭ জন ছাত্রীকে সম্মাননা দিয়েছে। ■

ওয়েলকাম টু মিরর ওয়ার্ল্ড

আশরাফ পিন্টু

বাড়িতে পা রেখেই স্বনন জোরে জোরে মাকে ডাকতে থাকে; কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। কলিং বেল টেপে কয়েকবার। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে দেয় মাঝবয়েসি এক নারী। স্বনন ওনাকে খুশিতে জড়িয়ে ধরে বলে, ভালো আছো তো মম? মিম কোথায়, ওকে দেখছি না যে?

মা ওর দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, কোনো কথা বলে না।

মাকে চুপ করে থাকতে দেখে স্বনন পুনরায় বলে, মম, আমি তোমার ছেলে স্বনন। অনেকদিন পর এসেছি, এ জন্যে চিনতে হয়ত কষ্ট হচ্ছে।

না মা-নে... তুই তো অফিসে গেলি কিছুক্ষণ আগে।

কী বলছ এ সব! আমি তো গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ঘুরে এখানে এলাম। কয়েকবার বিপদেও পড়েছিলাম কিন্তু তোমাদের দোয়ায় বেঁচে গেছি। তোমাদের আদরের ধন স্বনন এখন মহাকাশ বিজ্ঞানী।

কিন্তু আমার ছেলের নাম তো সম্বন। তা নাম যাই হোক, ও তো এ গ্রহের বাইরে কোথাও যায়নি। ও তো শুধু গবেষণা নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

মম, কোথাও তোমার ভুল হচ্ছে। অনেকদিন পর দেখা তো তাই এমন মনে হচ্ছে। আচ্ছা মিম কোথায়?

মিম্মো? ও ভার্সিটিতে গিয়েছে। আয়, ভিতরে আয়।

স্বননকে নিয়ে মা ঘরের ভিতর ঢোকে। অনেকদিন পরে হলেও রুমগুলো চিনতে একটু কষ্ট হয়। রুমগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে। অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। স্বনন ওর নিজের রুমে ঢোকে। রুমটি মিম হয়ত দখল করে নিয়েছে। মেডিক্যাল সায়েন্সের অনেকগুলো বই টেবিলের উপর ছড়ানো রয়েছে। স্বনন অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে রুমগুলো দেখার পর দেয়ালে টাঙানো বাবার ছবি দেখে জিজ্ঞেস করে, মম, ড্যাডি আসবে কখন?

তুই জানিস না, তোর ড্যাডি না কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছে।

হ্যাঁ, অনেকদিন যোগাযোগ নেই তো...

কী বলছিস এসব। বার বার একই কথা। তোর ড্যাডি মারা যাবার সময় তুই ছিলি না ঠিকই কিন্তু খবর তো জানিস।

খেয়াল নেই তো। তাছাড়া...

এমন সময় একটি সুন্দর মিউজিকে কলিং বেল বেজে ওঠে। 'এই বুঝি মিম্মো এল।' বলে মা তাড়াতাড়ি দরজার কাছে চলে যায়। একটু পরে ২১-২২ বছরের একজন তরুণী ঘরে ঢোকে। তরুণীর গায়ের রং শ্যামলা। লম্বা ছিপছিপে, হালকা দোহারা গড়নের। হরিণের মতো মায়াবী দুটি চোখ। স্বননকে দেখেই মিম্মো চমকে ওঠে, দাদা তুই বাড়িতে এলি কখন?

তুই কেমন আছিস, কতদিন দেখি না তোকে?

কি বলছিস এসব! একটু আগেই না তোর সাথে দেখা হলো। তুই না আমার ক্যাম্পাসে এসেছিলি বিজ্ঞানী জিম্পনের সাথে দেখা করতে।

কই না তো। আমি তো এলাম সেই সুদূর এক গ্রহালোক থেকে। কতদিন তোদের দেখি না, আয় বোন কাছে আয়। স্বনন মিম্মোকে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকে। মিম্মো অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে থাকে।

ঘরে ঢুকেই সম্বন অবাক হয়ে যায় ওর মতো আরেকজনকে দেখে। স্বননও অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে সম্বনের দিকে। মা, মিম্মো ওরাও অবাক নয়নে দেখতে থাকে দু'জনকে। হুবহু একই চেহারার দুজন। কোথাও পার্থক্য চোখে পড়ছে না। একই চোখ, একই মুখমণ্ডল। শুধু গায়ের রঙে একটু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। স্বননের গায়ের রং শ্যামলা আর সম্বনের ফর্সা। মা অবাক হয়ে ভাবে– তার তো দুই ছেলেমেয়ে সম্বন আর মিম্মো। তার তো কখনো যমজ ছেলে জন্মেনি যে ওরা দুজন যমজ ভাই হতে পারে। কারো মুখ থেকে অনেকক্ষণ কথা বেরোয় না। মা-ই প্রথমে মুখ খোলে। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য বলে, সম্বন, ও তোর যমজ ভাই।

কই, আগে দেখিনি তো? সম্বন বলে।

ও হারিয়ে গিয়েছিল।

কবে, কখন? সন্দেহের দৃষ্টি সম্বনের চোখেমুখে।

সেই ছোটোবেলায়।

কিন্তু মম, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে ও কোনো প্রতারক। প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে চেহারা পরিবর্তন করে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে।

কী বলছিস এসব?

হ্যাঁ মম। বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গেছে। আগে ওর ব্লাড পরীক্ষা করে দেখি। মিম্মোর দিকে তাকিয়ে বলে, ওকে ল্যাবরেটরি রুমে নিয়ে যা মিম্মো।

মিম্মো স্বননকে হাত ধরে ল্যাবরেটরি রুমে নিয়ে যায়। মিম্মো নিজেই ডাক্তার, ইন্টার্নি করছে। সে স্বননকে ডিএনএ টেস্ট করার জন্য একটি যন্ত্রের সামনে বসায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কিছুক্ষণ পরীক্ষানিরীক্ষা করার পর রিপোর্ট হাতে সম্বনের সামনে এসে বলে, দাদা, আমাদের কারো সাথে ওনার ডিএনএর কোনো মিল খুঁজে পাওয়া গেল না। উনি আমাদের ভাই নন।

সম্বন এবার রেগে যায়–বলে, কেন তুমি এখানে এসেছ? কী উদ্দেশ্য তোমার?

স্বনন এতক্ষণ হতভম্বের মতো সব শুনছিল। কী উত্তর দেবে ভেবে পাচ্ছিল না। তাহলে বনবন কী ওকে পৃথিবীতে রেখে না গিয়ে ভুল করে অন্য কোথাও রেখে গিয়েছে? ওরা ওর আত্মীয়স্বজন হলে কেউ চিনবে না কেন? কোনো স্মৃতিও তো মেলাতে পারছে না– যা থেকে প্রমাণ করা যায় ও ওদের পরিবারেরই সদস্য। ডিএনএ টেস্টেও তো কোনো ফল পাওয়া গেল না।

কী ভাবছ? কী চালাকি নিয়ে এসেছ এখানে, বলো? জানো তো, এখানে যে-কোনো অপরাধের সাজা মৃত্যুদণ্ড। অপরাধ প্রমাণিত হলে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।

স্বনন কী বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। শান্তস্বরে বলে, আমাদের কোথাও হয়ত ভুল হচ্ছে।

অত কিছু বুঝি না। তোমাকে নিয়ে আরো পরীক্ষানিরীক্ষা করব। তুমি না বললেও তোমার উদ্দেশ্য আমরা ঠিকই খুঁজে বের করতে পারব। তুমি কে, কী তোমার পরিচয়– সব চলো আমার সাথে।

সম্বন স্বননকে নিয়ে দ্রুত রুম থেকে বের হয়ে যায়।

সম্বন স্বননকে নিয়ে একটি বিশাল গবেষণাগারে ঢোকে। বিভিন্ন বয়সের বিজ্ঞানীরা এখানে বিভিন্ন গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছেন। সম্বন একটি আবছায়া রুমের ভিতর ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। ওখানে একজন

বয়োবৃদ্ধ বিজ্ঞানী নিমগ্নচিত্তে গবেষণা করছিলেন। সম্বন স্বননকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বিজ্ঞানীকে উদ্দেশ্য করে বলে, মি. জিম্পন; ওনার শরীরের ভিতরে-বাইরে সমস্ত জায়গায় পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখতে হবে, উনি আসলে কে? কোথা থেকে এসেছে?

বিজ্ঞানী জিম্পন স্বননকে একটি রোবটের কাছে নিয়ে যায়। রোবটের আকৃতি মানুষের মতো। রোবটটির সামনে স্বননকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। রোবটের একটি হাত স্বননের মাথায় ও আরেকটি হাত ওর বুকের ওপর স্থাপন করে বিজ্ঞানী। প্রায় দশ মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর রোবটটির দুহাত স্বননের কাছে শরীর থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। এরপর একটি বোতাম টিপতেই দুহাত থেকে দুটি ছোটোকাগজ বেরিয়ে আসে। কাগজটি পড়ে বিজ্ঞানী জিম্পন সম্বনকে বলে, ও তোমার ভাই নয়। ও পৃথিবী নামক একটি গ্রহ থেকে এখানে এসেছে।

পৃথিবী! সে তো অনেক দূর? সম্বন অবাক হয়।

হ্যাঁ, এখান থেকে প্রায় ৬০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে এর অবস্থান।

ও এখানে এল কীভাবে?

হয়ত উন্নত গ্রহের কোনো প্রাণী এখানে ভুলক্রমে নামিয়ে দিয়ে গেছে।

পৃথিবী সম্পর্কে আমার অল্প কিছু ধারণা আছে। আপনি কী এর সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলতে পারেন? সম্বন হঠাৎ পৃথিবী সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ, আমরা গবেষণা করে যতটুকু জেনেছি তা হলো–পৃথিবী হলো আমাদের 'মিরর ওয়ার্ল্ড'-এর মতো । উদ্ভিদ, জীবজন্তু আর মানুষের বসবাস উপযোগী একটি সবুজ সুন্দর গ্রহ। আমাদের গ্রহের সাথে পৃথিবীর আরো অনেক মিল রয়েছে। আমাদের মতো ওখানে যেমন পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, বনজঙ্গল রয়েছে তেমনি আমাদের চেহারার সাথে ওদের মানুষের চেহারার রয়েছে অনেক মিল।

এমন হবে কেন?

ওদের পৃথিবীরই একটা 'মিরর ইমেজ' হলো আমাদের এই 'মিরর ওয়ার্ল্ড'। বিজ্ঞানীরা অন্য কথায় যাকে বলেন–'প্যারালাল ইউনিভার্স'–অনেকটা যমজ ভাইয়ের মতো। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে জেনেছে–এক সময় এই দুটি গ্রহ অভিন্ন যমজ ভাইয়ের মতো একটার সাথে আরেকটার জোড়া লাগানো ছিল। বিগব্যাং বা মহাজাগতিক বিপর্যয়ে পড়ে গ্রহ দুটি দু-দিকে ছিটকে পড়ে।

বলেন কী! সম্বনের চোখ বড়ো হয়ে ওঠে।

আরেকটা কথা, ও কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে এখানে আসেনি। ভুলক্রমে এখানে এসে পড়েছে। যতদিন ও এখানে থাকে ততদিন ওকে আমাদের এ গ্রহটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাও, প্রকৃতি ও আমাদের অভিনব আবিষ্কারগুলো দেখিয়ে ওকে মুগ্ধ করো।

সম্বন মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে স্বননকে নিয়ে রুম থেকে বের হয়ে যায়। রুম থেকে বেরিয়েই স্বননকে জড়িয়ে ধরে বলে, আমাকে ক্ষমা করো বন্ধু। আজ থেকে তুমি আমার প্রাণের বন্ধু। আমি তোমাদের পৃথিবী সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। আমিও তোমাকে আমাদের এ গ্রহটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাব।

স্বনন এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি; শুধু অবাক হয়ে শুনছিল ওদের কথাবার্তা। 'প্যারালাল ইউনিভার্স'–এর কথা কোথায় যেন ও শুনেছিল কিন্তু মনে করতে পারে না। শুধু এটুকুই মনে আছে–পৃথিবীর মতোই নাকি এখানকার সবকিছু।

কী ভাবছ স্বনন? তোমাদের পৃথিবী সম্পর্কে কিছু বলবে?

আমাদের পৃথিবী তোমাদের গ্রহের মতোই প্রায় সবকিছু। এ জন্যেই হয়ত ভুল করে বনবন আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে গেছে।

বনবন কে?

ভিনগ্রহের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলে, আচ্ছা, আমাদের পৃথিবী থেকে তোমাদের কি কোনো পার্থক্য আছে?

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে হয়ত তেমন কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু আবিষ্কারের দিক দিয়ে হয়ত পার্থক্য থাকতে পারে।

যেমন?

তোমরা কি অন্যগ্রহের দৃশ্য দেখার কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করেছো?

না।

আমরা করেছি। এই যন্ত্র দিয়ে আমরা ৭০ মিলিয়নেরও অধিক আলোকবর্ষ দূরের কোনো দৃশ্য সরাসরি দেখতে পারি।

বলো কী! আমাকে কী দেখাতে পারবে?

কেন পারব না, এসো আমার সাথে।

স্বনন সম্বনের পিছু পিছু হাঁটতে থাকে।

স্বনন ও সম্বন হাঁটতে হাঁটতে গবেষণাগারের একেবারে শেষপ্রান্তে চলে আসে। ওরা দুজন একটি রুমে ঢুকে পড়ে। রুমের ভিতরে থাকা একটি বেটে রোবট দুজনকে স্যালুট জানায়। সম্বন মাথা নেড়ে স্যালুটের জবাব দিয়ে দেয়ালে ঝুলানো একটি বড়ো মনিটরের পাশে দাঁড়ায়। এরপর স্বননকে উদ্দেশ্য করে বলে, বলো কী দেখতে চাও?

স্বনন জবাব দেয়, আমি আমার পৈত্রিক নিবাস বাংলাদেশের দৃশ্য দেখতে চাই। সম্বন পেনড্রাইভের মতো ছোট্ট একটি রিমোট দিয়ে মনিটরটি চালু করে। এরপর ভেসে ওঠে একের পর এক দৃশ্য :

আরে! এ তো আমার ফেলে আসা বাংলাদেশ নয়। এ তো অনেক আগের ভারতবর্ষ। বাঙালিদের মধ্যে ইংরেজদেরও দেখা যাচ্ছে! যে দৃশ্যগুলো ভেসে উঠছে তা ও ইতিহাসে পড়েছে। হ্যাঁ, ওই তো নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা যাচ্ছেন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। স্বনন কৌতূহল দমিয়ে রাখতে না পেরে সম্বনকে বলে, এ তো অতীতের দৃশ্য মনে হচ্ছে।

না, এটা তোমাকে সরাসরি (লাইভ) দেখানো হচ্ছে।

কী বলছ এসব? নবাব সিরাজ-উদ-দ্দৌলা, ইংরেজ আমল তো বহুকাল পূর্বে শেষ হয়ে গেছে। এগুলো আমরা ইতিহাসে পড়েছি।

তোমাদের পৃথিবী তো শেষ হয়েছে অর্থাৎ অতীত হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের এখানে এখনো অতীত হয়নি।

বুঝলাম না কিছু।

আমরা তোমাদের পৃথিবী থেকে প্রায় ৬০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছি। অর্থাৎ তোমাদের পৃথিবী থেকে এখানে আলো এসে পৌছাতে ৬০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ সময় লাগে। ফলে তোমাদের কাছে যা অতীত আমাদের কাছে তা বর্তমান।

সেই জন্যে আমি পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া বাস্তব দৃশ্যগুলো সরাসরি দেখতে পাচ্ছি।

হ্যাঁ। ওই দেখ–মীরজাফর ইংরেজদের সাথে কী যেন ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে।

শব্দ শোনা যাবে?

খুব অল্প। ও তো ফিসফিস করে বলছে তাই শব্দ ধরা পড়ছে না। জোরে বললে হয়ত শোনা যেত।

সিরাজ-উদ-দ্দৌলাকে যদি বাঁচানো যেত!

যাবে কীভাবে? অত দ্রুতগামী নভোযান আমাদের গ্রহে নেই। আর গেলেও সেখানে স্ব-শরীরে যেতে পারবে না। আলোর গতিবেগে চলা নভোযানে গেলে অশরীরী হতে হয়– যা আমরা এখনো হতে পারেনি।

আরো উন্নত গ্রহের প্রাণীরা হয়ত পারবে।

হ্যাঁ, আমিও শুনেছি। এমন কিছু গ্রহ নাকি আছে যাদের প্রাণীরা কঠিন দেহ থেকে তরল বা বায়বীয় পদার্থে রূপ নিতে পারে।

ওই দেখ, ইংরেজরা চলে গেল। মীরজাফরকে খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছে।

আমরা অক্ষম, চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

কোনো সংবাদ দেবারও কোনো উপায় নেই। না, সে রকম যন্ত্র এখনো আবিষ্কার করতে পারিনি। হয়ত ভবিষ্যতে পারব।

ওই যে দ্যাখো, নবাবকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। নাহ্! এসব আর দেখতে ইচ্ছে করছে না। বন্ধ করো।

স্বননের কথায় সম্বন রিমোট টিপে মনিটরটি বন্ধ করে দেয়। স্বননের মন খারাপ দেখে সম্বন ওকে হাত ধরে টেনে নিয়ে বলে, এসো তোমার মন ভালো করে দেই।

ওরা দুজন রুম থেকে বেরিয়ে পড়ে।

সম্বন কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে স্বননকে নিয়ে গবেষণাগারের অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি রুমে ঢুকে পড়ে। রুমের ভিতর কেমন ভৌতিক পরিবেশ। গা ছমছম করে ওঠে স্বননের। বলে, এ কোথায় নিয়ে এলে তুমি? অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে সম্বন। অন্ধকারে অট্টহাসি শুনে স্বনন আরো ভড়কে যায়। হাসি শেষ করে সম্বন বলে, কী ভয় পাচ্ছো? এরপর হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে আলোয় ভরে ওঠে রুমটি। স্বনন তাকিয়ে দেখে পূর্বের মতোই একটি মনিটর দেয়ালে লাগানো রয়েছে। ওখান থেকেই আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সম্বন স্বননকে উদ্দেশ্য করে বলে, তুমি কি তোমার বাবার সাথে কথা বলবে?

হ্যাঁ, বলেই পরক্ষণে বলে ওঠে, ড্যাডি তো মারা গেছে সেই কবে।

তাও বলা যাবে। সম্বন রহস্যের হাসি হেসে বলে।

কীভাবে সম্ভব?

কেন নয়। মানুষ বা প্রাণীরা কি আসলে মারা যায়? এদের আসলে দেহান্তর ঘটে। শক্তির নিত্যতা সূত্র মনে নেই তোমার–'শক্তির সৃষ্টি নেই, ধ্বংস নেই, রূপান্তর আছে মাত্র'। তোমার বাবার তো মৃত্যু ঘটেনি, তিনি এখন রূপান্তরিত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন জগতে।

এবার তোমার বাবার ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেমের প্রথম দুটি অক্ষর বলো।

এ এবং পি।

স্বনন দেখল মনিটরে এ এবং পি দৃশ্য ভেসে ওঠার পর পরই দরাজ গলার শব্দ হলো, কেমন আছিস স্বনন? তোর মা, মিম কেমন আছে?

আমি ভালো আছি। বলার পর স্বনন আস্তে আস্তে সম্বনকে উদ্দেশ্য করে বলল, ড্যাডিকে দেখা যাচ্ছে না কেন?

সম্বন জবাব দিলো, উনি এখন বায়বীয় অবস্থায় বিচরণ করছেন। তাই তার শরীর দেখা যাচ্ছে না।

স্বনন বলল, তাহলে কি আমি ধরে নেব আমি ওনার আত্মার সাথে কথা বলছি।

সম্বন মাথা নেড়ে হ্যাঁ-বোধক জবাব দিতেই আবার মনিটর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কথা বলছিস না কেন স্বনন? তোর মা, মিম কেমন আছে?

ড্যাডি, ওদের সঙ্গে অনেক দিন দেখা নেই আমার।

তুই কোথায় এখন?

আমি পৃথিবী থেকে অনেক অ-নে-ক দূরের একটি গ্রহে আছি। তুমি কেমন আছো ড্যাডি?

আমি ভালোই আছি। আমিও তোর মতো বিভিন্ন গ্রহ-গ্রহান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

তুমি কি আবার পৃথিবীতে ফিরতে পারবে?

উপর থেকে নির্দেশ না দিলে স্বেচ্ছায় কোথাও যেতে পারি না। তোরা যদি এ গ্রহের মতো উন্নত

যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারিস তখন হয়ত না গেলেও তোদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হবে। আজ তাহলে আসি। আমাকে আবার অন্য এক গ্রহে পরিদর্শনে যেতে হবে।

পরিদর্শন করে তোমরা কী করো?

সেটা বলা যাবে না, নিষেধ আছে। তাহলে আজ বিদায়।

মনিটর থেকে শব্দ বন্ধ হয়ে যায়।

স্বনন সম্বনের দিকে তাকিয়ে বলে, সত্যি মনটা ভালো হয়ে গেল বন্ধু। তোমরা এত উন্নতমানের যন্ত্র আবিষ্কার করেছ, আমরা যে কবে এমন যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারব।

তোমরাও পারবে।

আমাকে পৃথিবীতে পাঠাতে পারবে? স্বননের হঠাৎ পৃথিবীতে ফিরে যাবার কথা মনে হয়।

না। এমন নভোযান আমাদের নেই।

তাহলে উপায়?

উপায় হলো তোমার সেই বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করা।

আমার ইথার যন্ত্রের সাহায্যে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না।

নাম্বারটা দাও।

সম্বন স্বননের কাছে থেকে নাম্বারটি নিয়ে পেপার ওয়েটের মতো গোলাকার একটি স্বচ্ছ যন্ত্রে প্লেস করে। কিছুক্ষণ পর যন্ত্রটির ভিতরে বনবনের মুখ ভেসে ওঠে। যন্ত্রটি স্বননের হাতে দিয়ে বলে, কথা বলো।

যন্ত্রটি মুখের সামনে ধরে স্বনন বলে, কেমন আছো বনবন?

আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?

আমি তো পৃথিবীতে পৌঁছিনি। তুমি ভুল করে পৃথিবীর মতো একটি গ্রহে রেখে গিয়েছ।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। এখন তুমি আবার আমাকে পৃথিবীতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করো।

ঠিক আছে। গ্রহটির নাম কী?

‘মিরর ওয়ার্ল্ড’ নামের একটি গ্রহ।

পৃথিবীর নামের সাথেও তো বেশ মিল আছে। ঠিক আছে, আমি আসছি। একটু সময় লাগবে। আমি এখন তোমাদের গ্রহ থেকে অনেক অ-নে-ক দূরে অবস্থান করছি।

মোবাইলের ভিডিও কলের মতো এতক্ষণ ওরা কথা বলছিল। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রটি কালো হয়ে গেল। যন্ত্রটি সেলফে রেখে দুজনেই রুম থেকে বের হয়ে গেল।

প্রায় একমাস পর।

স্বনন সম্বনের সাথে ঘুরে ঘুরে ‘মিরর ওয়ার্ল্ড’ নামের গ্রহটি ঘুরে ঘুরে দেখছিল। পৃথিবীর মতোই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর গ্রহটি। পাহাড়-পর্বত, নদী, জলপ্রপাত, বনজঙ্গল সবই আছে পৃথিবীর মতো। শুধু প্রযুক্তিতে ওরা অনেক এগিয়ে।

কথা বলতে বলতে ওরা একটি সবুজ মাঠের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ দেখল মাঠের মাঝখানে ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে একটি গোলাকার বস্তু এসে পড়ল। কিছুক্ষণ পর কুণ্ডলি থেকে একটি লম্বা ছিপছিপে প্রাণী দৃশ্যমান হলো। ওরা দুজন একটু অবাক হয়ে এগুতে লাগল। কাছে যেতেই স্বনন খুশিতে চিৎকার দিয়ে উঠল, বনবন তুমি!

মৃদু হেসে বনবন বলল, হ্যাঁ, তোমাকে নিতে এলাম।

—এখন তাহলে আমি পৃথিবীতে যাব।

—এই নভোযানে করে পৃথিবীতে যাওয়া যাবে না। এটিতে করে প্রথমে আমরা ‘ইউনিভার্সাল সেন্টার’-এ যাবো। তারপর স্পেস শিপ পরিবর্তন করে পৃথিবীতে ল্যান্ড করব।

—এসো সম্বনের সাথে পরিচয় করে দেই।

স্বনন বনবনকে নিয়ে সম্বনের কাছে এল। বনবন সম্বনের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল। এ যে স্বননেরই প্রতিচ্ছবি! স্বনন সম্বনকে বলল, এ আমার বন্ধু বনবন, গ-৭ গ্রহের বাসিন্দা। সম্বন বনবনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ওয়েলকাম টু ‘মিরর ওয়ার্ল্ড’। ■

হারিয়ে যাওয়া শিং শিল্প

মোহাম্মদ আসাদ

ঢাকার হারিয়ে যাওয়া এক শিল্পের নাম শিং শিল্প। ইংরেজ ও পাকিস্তানামলে বাংলায় শিং দিয়ে তৈরি উপকরণের ব্যবসা ছিল রমরমা। ইংরেজ আমলে পুরনো ঢাকার লালবাগের, আমলিগোলা এলাকায় শিং দিয়ে বোতাম তৈরি করত ঘরে ঘরে। সে সময়ে বাংলার রপ্তানি পণ্যের তালিকায় শিং-এর তৈরি বোতামও ছিল। এর সাথে যুক্ত হয় শিং-এর পানপাত্র, ছড়ি এবং গৃহসজ্জার উপকরণ।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানিরা চলে যাওয়ায় শিং শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ঢাকায় টিকে আছে শিং-এর শিল্পকর্ম তৈরির ৫০ বছরের পুরোনো একটি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটির টিকিয়ে রেখেছেন মাহমুদ। বাংলাদেশে একমাত্র মাহমুদই শিং দিয়ে উপকরণ তৈরি করে থাকেন।

নানারকম উপকরণ তৈরির জন্য শিং সংগ্রহের সঠিক সময় কোরবানির ঈদের পরের কয়েকটি দিন। সারা বছর বিচ্ছিনভাবে মৃত পশু ও মাংসের দোকানে জবাইকৃত পশুর শিং পাওয়া গেলেও কোরবানির ঈদের পর ব্যাপকভাবে শিং পাওয়া যায়। এই সময়ে দেশের প্রায় সমস্ত শিং এসে জড়ো হয় ঢাকার হাজারিবাগে। সেখান থেকে কোরবানির ঈদের পর পরই শিং সংগ্রহ করেন শিং শিল্পী। কোন শিং দিয়ে কী তৈরি করা যাবে তা শিং দেখেই তারা বুঝতে পারেন। সেই হিসেবেই এক বছরের জন্য শিং সংগ্রহ করা হয়। এই সময়ে শিং সংগ্রহ না করা হলে, পরে এই শিং বিদেশে চলে যায়। বিদেশে শিং দিয়ে মেডিসিনাল উপকরণ তৈরি হয় বলে জানালেন মাহমুদ।

মাহমুদের বাবা হুমায়ুন কবির ছিলেন পুরান ঢাকার আমলিগোলার বাসিন্দা। তার বাপ-দাদার সুনাম ছিল দর্জি হিসেবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার বেশ কয়েক বছর আগে দর্জি ব্যবসায় ধস নামে। তিনি বিদেশে পাড়ি জমানোর সিদ্ধান্ত নেন। সব জায়গা-জমি বিক্রি করে টাকা তুলে দেন একজন আদম ব্যবসায়ীর হাতে। আদম ব্যবসায়ী টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যায়। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে অথই সমুদ্রে পড়ে যান তিনি। বাঁচার তাগিদে এটা-ওটা করে দিন কাটে তার। আমলিগোলার একজন শিং দিয়ে এটা-সেটা বানিয়ে বিক্রি

করতেন বাজারে। হুমায়ুন তার কাছ থেকে শিংজাত পণ্য সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করতে শুরু করেন। এক সময় শিং দিয়ে পণ্য বানানোর কায়দাও শিখে নেন তিনি। লোকটি মারা গেলে হুমায়ুন নিজেই শিং দিয়ে তৈরি করা শুরু করেন ঘর সাজানোর নানা উপকরণ। হুমায়ুন মারা যাওয়ার পর ব্যাবসার হাল ধরেন তার স্ত্রী। ২২ বছর ধরে ব্যবসাটি পরিচালনা করছেন মাহমুদের মা সালমা আক্তার। তিনিই হাতে ধরে শিখিয়েছেন মাহমুদকে। সালমা মারা যাওয়ার পর মাহমুদই দেখছেন এই কাজ।

মাহমুদ জানালেন— দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করা গরু-মহিষের শিং প্রথমে জড়ো করা হয় হাজারিবাগে। সেখান থেকে কাঁচা শিং সংগ্রহ করে দুই দিন রেখে পচাতে হয়। পচানোর পর একটু আঘাতেই ভেতরের হাড়ের মতো অংশ বের হয়ে যায়। হাড়মুক্ত শিং-এর দুই মাথা কেটে সাধুদের ব্যবহৃত শিঙ্গা তৈরি করা হয়। এছাড়া শিং দিয়ে তৈরি করা হয় পাখি, চিংড়ি মাছ, ফুলদানি, বয়স্কদের ব্যবহৃত লাঠি, চিরুনি ইত্যাদি। এছাড়া নিত্যদিনের ব্যবহার্য বিভিন্ন সামগ্রীও তৈরি করেন তিনি। কাঁচা শিং প্রক্রিয়াজাত করার জায়গা পাওয়াটাই দুষ্কর। কারণ, শিং পচে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। আবার নানা কারণে কর্মচারীও পাওয়া যায় না।। তাই মাহমুদ একাই কাজ করে চলে। দিনে সে দুইটি উপকরণ তৈরি করতে পারে। এরপর এই শিল্প আর টিকে থাকবে কিনা সে নিয়ে এখন প্রশ্ন। ■

প্রতিবন্ধীদের কাজের সুবিধা বাড়ছে

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয়, তারাও দেশের সম্পদের আলোকে সরকার প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে প্রতিনিয়ত কার্যক্রম চালিয়ে যাছে। এরই আলোকে নতুন অর্থবছরে প্রতিবন্ধীদের চাকরি প্রদানের জন্য নেওয়া হয়েছে আরো একটি পদক্ষেপ। যাতে প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

কোনো প্রতিষ্ঠান তার মোট জনবলের ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধীদের নিয়োগ দিলে তবে সে প্রতিষ্ঠান ৫ শতাংশ আয়কর ছাড় পাবে। জাতীয় সংসদে ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপনকালে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এ প্রস্তাব করেন।

অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেন, কোনো প্রতিষ্ঠানের মোট জনবলের ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধীদের নিয়োগ দিলে সে প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় করের ৫ শতাংশ কর রেয়াত প্রদানের প্রস্তাব করছি।

গত বছর চিকিৎসা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের যাতায়াত ও সেবা গ্রহণে বিশেষ সুবিধা ব্যবস্থা না রাখলে অতিরিক্ত ৫ শতাংশ হারে আয়কর আরোপের বিধান করা হয়েছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এর আওতা বাড়িয়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও এনজিওতে এ বিধান আরোপের প্রস্তাব করা হয়। তবে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যাতে সেবা প্রদানের জন্য যথেষ্ট সময় পায় সে জন্য ২০১৯-২০ কর বছর থেকে নতুন আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ বিধান কার্যকর হবে।

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং এনজিওতে যদি প্রতিবন্ধীদের যাতায়াত ও সেবা গ্রহণের বিশেষ সুবিধা যদি না রাখা হয়, তবে অতিরিক্ত ৫ শতাংশ হারে আয়কর আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে নতুন অর্থবছরের (২০১৯-২০) প্রস্তাবিত বাজেটে। ■

গল্প

ফুলি

শারমিন জিকরিয়া

সকালবেলা। পূর্ব আকাশে সূর্য উঠেছে। একদল শিশু শস্য ক্ষেতের ভেতর দিয়ে ছুটে আসছে। ওদের সাথে আছে দিপু এবং ফুলি। দিপু ফুলির আঠারো মাসের ছোটো ভাই।

ফুলি কথা বলতে পারে না। ঠিকমতো হাঁটতে পারে না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। কখনো পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর করে হাঁটে। পথের দু'ধারে বেড়ে উঠা ছোটো ছোটো গাছপালার পাতা ছিঁড়ে সে নিজ গালে মাখছে। এখন সে ভাবলেশহীনভাবে হাসছে। ওকে দেখে অন্যান্য ছেলে-মেয়েরা মুখ টিপে হাসে।

লাল জামা গায়ে একটি শিশু ও পথ দিয়ে যাচ্ছিল ফুলি তার পরনের জামা ধরে টানতে থাকে, শিশুটি ভয় পায়। কাঁদতে থাকে। ফুলি তখনো শিশুটির জামা ধরে আছে। এসব দেখে বড়ো রাগ হয় দিপুর। সে এগিয়ে গিয়ে হাত ছাড়িয়ে নেয়। বলে এসব করছ টা কী?

এতে ফুলির রাগ আরো বেড়ে যায়। রাগত চোখে সে তার দুহাত দিয়ে নিজ গাল চেপে ধরে। জ্ঞ- জ্ঞ শব্দ করতে থাকে। দিপু বলল, তাড়াতাড়ি চল, স্কুল দেরি হইয়া যাইব।

ফুলি ওর দিকে তাকায়, দিপু হাত-পা নেড়ে ইশারায় তাকে বুঝিয়ে দেয়। ফুলি বুঝতে পেরে মাথা নাড়ে। দিপুর সাথে হেঁটে যায়।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা স্কুলে এসে পৌঁছে। এটা ফুলির স্কুল। ফুলি কথা না বলতে পারলে কী হবে। স্কুলের স্যার বলেছেন, এখানে এই স্কুলে এলে ছেলে-মেয়েদের সাথে মিশলে, ক্লাস করলে, সে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে। মা সেলিনা বেগম এক বুক আশা নিয়ে তাই মেয়েকে এই ভাগোলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছেন।

এই স্কুলের ছেলে-মেয়েরা এখানে সেখানে নোংরা কাগজ, পলিথিন, কলার ছিলকা, ফেলে রাখে না। নিজ হাতে স্কুলঘর পরিষ্কার করে, সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ক্লাসে যায়।

ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা পড়ার শব্দ শোনা গেল। ফুলি ক্লাসরুমে ঢুকল। দিপু গাছতলায় এসে দাঁড়াল। এখান থেকে ফুলির ক্লাসের কিছুটা অংশ দেখা যায়। মাঝে মাঝে ক্লাস থেকে ফুলি

বারান্দায় বেরিয়ে আসে, তাকে খুঁজতে থাকে। না পেলে কান্না জুড়িয়ে দেয়।

অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সাথে ক্লাস করছে ফুলি। সে প্রথম বেঞ্চে বসে ক্লাস করছে। ভাবলেশহীনভাবে সে দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। স্যার পড়াচ্ছেন। একসময় তিনি ফুলির কাছে এসে দাঁড়ালেন। তার বই খুলে দিলেন। মনোযোগ আকর্ষণের জন্য টেবিলের দিকে তাকালেন। কতগুলো ইংরেজি বর্ণমালা টেবিলের উপর রাখা আছে। তিনি A বর্ণ দেখিয়ে একটি আপেল হাতে নিয়ে বললেন A ফর আপেল। এভাবে B বর্ণ দেখিয়ে একটি বল হাতে নিয়ে বললেন B ফর বল। তারপর পড়া বোর্ডে লিখেন। উচ্চারণ করেন। সাথে সাথে ছাত্রছাত্রীরাও সমস্বরে উচ্চারণ করে। ফুলি ওদের দিকে তাকায়, তার কণ্ঠনালি তির তির করে কাঁপতে থাকে।

স্যার বললেন, তোমরা এবার খাতায় লিখ। ছাত্রছাত্রীরা খাতায় লিখতে এখন ব্যস্ত। স্যার ফুলিকে লিখতে সাহায্য করছেন। স্যারকে পাশে পেয়ে ফুলি খুব খুশি। সে একবার স্যারের দিকে একবার খাতার দিকে তাকায়। ঢং ঢং ঢং ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠে। ছেলে মেয়েরা বই-খাতা গুছাতে ব্যস্ত হয়ে উঠে।

দিপু গাছতলায় দাঁড়িয়ে ফুলির জন্য অপেক্ষা করছিল। ফুলি ক্লাস থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল। এদিক ওদিক তাকালো, দিপু হাত উঁচিয়ে' 'ফুলি ও ফুলি' বলে ডাকতে ডাকতে ফুলির কাছে ছুটে এল। সে তাকে জড়িয়ে ধরে হাসতে থাকে। দিপু বলল, চল ফুলি বাইত যায়।

ফুলি ভাবলেশহীনভাবে তার দিকে তাকায়, দিপু ইশারায় তাকে বুঝিয়ে দেয় , বাড়ি বাড়ি, আমরা এখন বাড়ি যাব।

বুঝতে পেরে সে হাসে। ওরা দুজন বাড়ির পথে রওনা দেয়। পথে রাস্তার ধারে একটি ফুল বাগান, অনেক ফুল ফুটেছে। ফুলি বাগানের সামনে এসে দাঁড়ায়। ফুল নিয়ে সে খেলতে শুরু করে। হাসতে থাকে। উড়বার জন্য ডানা মেলছে। প্রজাপতি ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রজাপতি ধরা দেয় না।

সামনে একটি মস্ত বড়ো পাকুড় গাছ। শিকড়ে ছড়াছড়ি। শিকড় ছাড়িয়ে গাছটি তর তর করে বেড়ে উঠেছে। ফুলি দিপুকে দেখতে পেয়ে তার কাছে ছুটে যায়। দিপুর হাত চেপে ধরে, ইশারায় জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে।

দিপু হাত নেড়ে বলে, কিছু না।

ফুলি একই কথা আবারো জিজ্ঞেস করে।

দিপু পায়ে পায়ে ফুলির কাছে আসে, তার মুখের সামনে তার মুখটা নিয়ে এসে ইশারা করে এবং জোর গলায় বলে, ফুলি কও মা -আ-**আ-**। ফুলি মা আ-বলতে চেষ্টা করে, হয় না। খিল খিল করে হেসে উঠে।

দিপু আবারো সেই একইভাবে শব্দ উচ্চারণের চেষ্টা করে বলে, কও, মা-আ। ফুলি চেষ্টা করে। হয় না।

দিপু মন খারাপ করে হাত তুলে বলল, লও বাইত যাই।

সেলিনা বেগম বারান্দায় বসে শাক বাছছিলেন। হঠাৎ ফুলির কণ্ঠস্বর তার কানে বাজে। তিনি চমকে উঠেন। ফুলি বলছে, মা তুমি কনে? এই দেহো আমি কথা কইতাছি। মা ও মা...

সেলিনা বেগম চমকে উঠে, এদিক ওদিক তাকালেন। মনে মনে বললেন, হায় আল্লাহ! এ আমি কি ভাবতাছি। ফুলি তো কথা কইবার পারে না।

হঠাৎ। কোনো কিছু ফেলার শব্দ তার কানে আসে। একটি ফুলদানি দরজার সামনে এসে পড়ে। তিনি উঠে দাঁড়ান। ফুলির ঘরের দিকে হেঁটে যান। মনে মনে বলেন, কী হইল আবার?...

ফুলি ঘরে বসে রাগে ফুলতে থাকে। বিছানায় বসে বালিশ ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলছে। তার খেলনা, ফুলদানি এক এক করে ঘরের বাইরে ছুড়ে ফেলে।

সেলিনা বেগম ঘরে এলেন। তাকে বাধা দিয়ে বললেন, ছি! ওভাবে ছুড়তে হয় না দাও আমারে দাও।

তিনি ফুলির হাত থেকে এক প্রকার জোর করে খেলনা কেড়ে নেন। কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। খাটে নিয়ে বসান। তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। ফুলি হাত ইশারায় বলল, তোমার কী হইছে মা? তুমি কান্দ ক্যান?

সেলিনা বেগম হাত ইশারায় বললেন, তুই যে কথা কইবার পারস না, হেইর লাইগা কান্দি মা।

ফুলি মাকে ইশারা করে বলে, আজ আমার স্পিচ থেরাপি নেওয়া হয়নি। এখনই চলো।

সেলিনা বেগমের মুখ আনন্দে হেসে উঠে। তিনি ফুলিকে সাথে করে বারান্দায় এসে বসেন। একটি চেয়ারে ফুলিকে বসিয়ে ছোটো একটি চামচে করে

মুখের ভেতর নাড়াচাড়া করেন। স্পিচ থেরাপি দেন। ওকে কথা বলাতে চেষ্টা করান। ফুলি আপ্রাণ চেষ্টা করে, কথা আসে না। ফুলির বড়ো রাগ হয়, সে টেবিলের চামুচখানা ছুড়ে মাটিতে ফেলে দেয়।

সোমবার মেয়েকে সাথে নিয়ে সেলিনা বেগম স্কুলের পথে রওনা দিলেন। স্কুলে পৌঁছে ফুলি ক্লাসরুমে গিয়ে বসল। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সাথে ফুলি প্রথম সারিতে বসে ক্লাস করছে। ভাবলেশহীনভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ম্যাডাম একটি কবিতা আনন্দঘন পরিবেশে পড়ার জন্য বৃত্তাকারে ছাত্রছাত্রীর মাঝে তিনি এসে দাঁড়ালেন। হাতে তাল রেখে শিশুদের সাথে সাথে নিজেও আবৃত্তির স্বরে কবিতা পাঠ করলেন,

'নোটন নোটন পায়রাগুলো ঝোটন বেঁধেছে।

ওই পাড়েতে ছেলেমেয়ে নাইতে নেমেছে।'

ঢং ঢং ঢং ছুটির ঘণ্টা পড়ার শব্দ শোনা গেল। ছাত্রছাত্রীরা বই হাতে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এল। ফুলি ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে তার মাকে খুঁজতে থাকে। মাকে কোথাও না পেয়ে ভীষণ ভয় পেল। মাঠ পেরিয়ে বাইরে আসার জন্য মাঠে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে।

অন্যান্য অভিভাবকদের সাথে সেলিনা বেগম ফুলির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন সদর দরজার বাইরে। ছাত্রছাত্রীদের গেট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে, তার মনে হয় ফুলি তো ভেতরে আছে। ভয় পেলে তার বড়ো সমস্যা হবে। কান্নাকাটি শুরু করে দিবে- ভেবে দারোয়ানকে বলে কয়ে ভেতরে ঢুকলেন।

ফুলি দৌড়িয়ে আসছে। ছাত্রছাত্রীদের ভিড় ঠেলে আসতে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে সে মাটিতে পড়ে যায়। মা -আ-আ বলে কান্না জুড়িয়ে দিলো। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে থাকে। সেলিনা বেগম চমকে উঠেন। অবাক। তাড়াতাড়ি মেয়ের কাছে যান। ফুলি হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছে। তার পা দিয়ে রক্ত ঝরছে। সেলিনা বেগম যেন অবাক। ফুলি মায়ের দিকে তাকিয়ে ঠোট উলটিয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, মা ব্যথা।

ফুলির কণ্ঠে মা ডাক শুনে সেলিনা বেগমের মন কেঁদে উঠে। কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ওগো তোমরা কে কোথায় আছো দেইখা যাও, আমার ফুলি কথা কইতাছে। আজ আমার কোনো দুঃখ নাই। কষ্ট নাই। জ্বালা যন্ত্রণা কিচ্ছু নাই। এই স্কুল আমার মাইয়া ফুলিরে অনেক দিছে। মাস্টার সাবেরা তারে কথা কওনের অনুশীলন করাইছে। কেলাশের হক্কল ছাত্রছাত্রী তারে আপন কইরা নিছে। ওর লগে খেলছে। হাসছে। হাসাইছে। হেইর লাইগাইতো মাইয়া আমার কথা কইছে। আমারে মা বইলা ডাকছে।

বলতে বলতে কেঁদে উঠেন সেলিনা বেগম। তার চোখে আনন্দের বন্যা। ■

আসসিরাতুল বর্ণ,
৩য় শ্রেণি,
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

রাজার ডিমের স্বপ্ন

সাবরিনা আক্তার

এক দেশে ছিল এক রাজা। রাজার নাম হলো কুমার। তার বাসায় একটা কবুতর বাস করত। সে কবুতরটি নিয়ে রাজার অনেক স্বপ্ন। কবুতর ডিম পাড়বে, সেটা থেকে বাচ্চা বের হবে। রাজা কবুতরকে খুব ভালোবাসত। কিন্তু একদিন রাজার চোখে ফাঁকি দিয়ে কবুতরটি চলে গেল। রাজার মনে অনেক দুঃখ। রাজা একদিন বনের দিকে শিকার করতে গেল সেখানে রাজা শিকার করার সময় একটি টিয়া পাখির দেখা পেল। পাখিটা রাজার চোখে জল দেখল। পাখিটা রাজার সামনে চলে আসল। রাজা বলে পাখি আমার সামনে কেন এসেছ। তোমাকে আমি মারার জন্য এসেছি পাখিটা বলে আমাকে মারার জন্য আসলে তোমার চোখে জল কেন? পাখিটা বলে, আমি জানি কারণ তোমাকে কেউ কষ্ট দিয়েছে। সে রাগে তুমি পাখিদের মারার জন্য এসেছ। রাজা তখন পাখিকে সব কথাগুলো বলে। পাখিটা তখন বুঝতে পারল রাজাকে বলল, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। রাজা তখন খুশি হয়ে পাখিটাকে বাড়ি নিয়ে গেল। তখন পাখিটাকে রাজা সুন্দর একটা ঘর তৈরি করে দিলো। সে দিন থেকে পাখিটা অনেক ডিম পাড়ল আর ডিম থেকে অনেক গুলো বাচ্চা বের করল। রাজা খুব খুশি হলো। সে দিন থেকে রাজার সুখে দিন কাটতে লাগল। ■

৬ষ্ঠ শ্রেণি, উখিয়া হাই স্কুল, উখিয়া

বর্ষা

মোছা. শাম্মী আখতার

আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল
সকলেই তা জানে
এই দুমাস বৃষ্টি হবে
সকলেই তা মানে।

কালো মেঘের ভেলায় ভেসে
নামল বৃষ্টি অঝোর ধারায় শেষে।
জুড়াবে সকলের মন প্রাণ
এই তো খোদার অসীম দান।

৭ম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।

বৃষ্টি

মো. মুশফিক মিদুল

চারিদিকে খাঁ-খাঁ করছে জীবন
তাপদাহে বাড়ছে প্রতিনিয়ত হুতাশন
এক পসলা বৃষ্টি খোদা মোদের করো দান
গরমের কষ্টে সহে না, করো এর অবসান
অবশেষে বিধি বৃষ্টি দিয়েছে নামিয়ে
কঠিন গরম দিয়েছে থামিয়ে
সকালে স্কুলে চলছি যখন ছাতা ছাড়া
বৃষ্টি বড়ো আদর দিয়ে, ভিজিয়ে করেছে সারা।

৮ম শ্রেণি, মহানগর আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।

তাইছির ফারুকী (ইসরাক), ৪র্থ শ্রেণি, খিলগাঁও গভ. কলোনি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঢাকা।

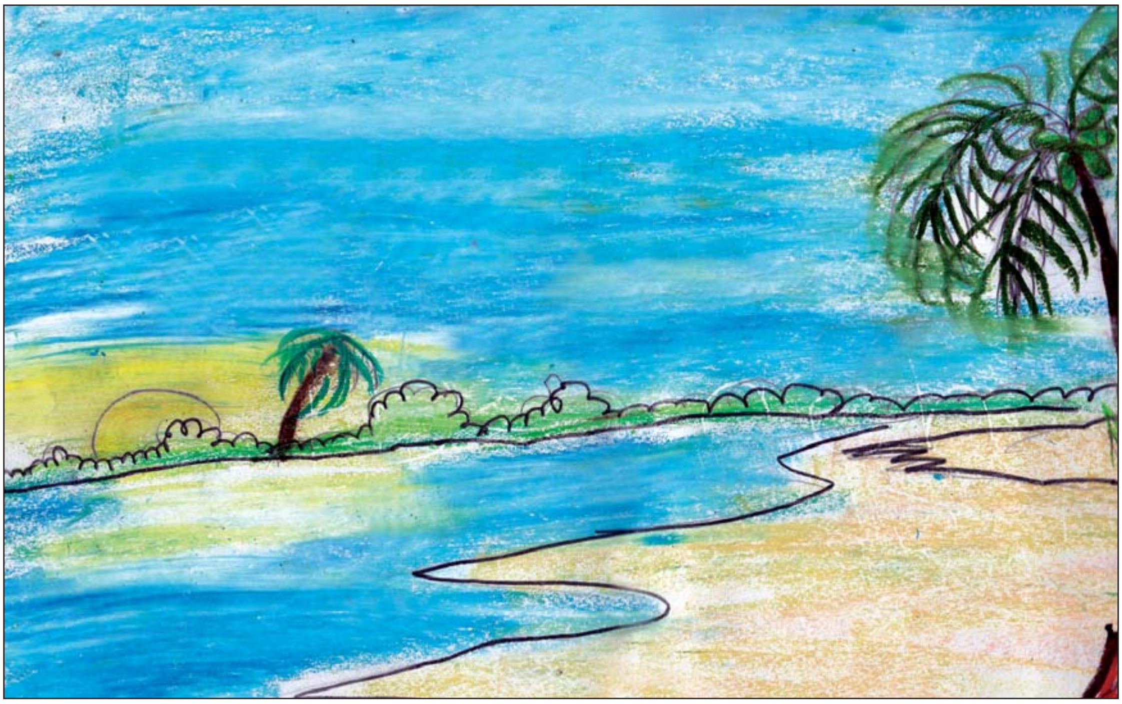

তাহমিদ আজমাঈন আহনাফ, ২য় শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল (ইংলিশ ভার্সন), পূর্ব রামপুরা, বনশ্রী, ঢাকা

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

এ মাসের শব্দ ধাঁধা

পাশাপাশি: ১. ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নাম, ৩.অনুপস্থিত, ৫. একটি বাংলা মাস, ৬. মাঠ, ৮. কুম্ভ, ১০.একটি স্বাধীন দেশের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অন্য একটি স্বাধীন দেশের অন্তর্ভুক্ত এলাকা, ১১. রক্তচোষা নামে পরিচিত সরীসৃপ প্রাণী

উপর-নিচ: ১. শহর, ২. স্বর্ণমুদ্রা, ৩.উষ্ণ, ৪. দেশের একমাত্র মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র যে নদীতে অবস্থিত, ৭. ঝালকাঠি জেলার একটি উপজেলা, ৮. লেখার উপাদান

■	১.			২.		■	■
■		■	■		■	■	■
৩.		৪.			■	৫.	
	■		■	■	■		■
৬.			৭.	■	৮.		৯.
■	■	■		■		■	
■	■	■	১০.				
১১.				■	■	■	■

এ মাসের ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৩	*		-	৭	=	
*	■	+	■	-	■	+
	*	১	+		=	৬
-	■	-	■	-	■	-
৫	+		-	১	=	
=	■	=	■	=	■	=
	*	৩	+		=	৫

গত সংখ্যার শব্দ ধাঁধার সমাধান:

■	বা	য়	বী	য়	■	ম	■
■	ন	■	■	■	■	য়	■
বি	র	তি	■	অ	বি	রা	ম
■	■	তি	প্পা	ন্ন	■	■	গ
অ	পে	ক্ষা	■	■	জা	হা	জ
■	ভু	■	ক	ল	ম	■	■
গা	লা	প	■	■	রু	■	■
■	ম	■	আ	স	ল	■	■

গত সংখ্যার ব্রেইন ইকুয়েশনের সমাধান:

২	*	৭	-	৬	=	৮
+	■	-	■	+	■	-
৬	/	২	+	৪	=	৭
/	■	/	■	-	■	+
৩	-	১	-	২	=	০
=	■	=	■	=	■	=
৪	+	৫	-	৮	=	১

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যেসব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: সুখকর, বাংলাদেশ, পাঠক, প্রখর, বালি, মলা মাছ, গাছ, আগুন, গুল্ম, কালি, বিরান, পরাগ।

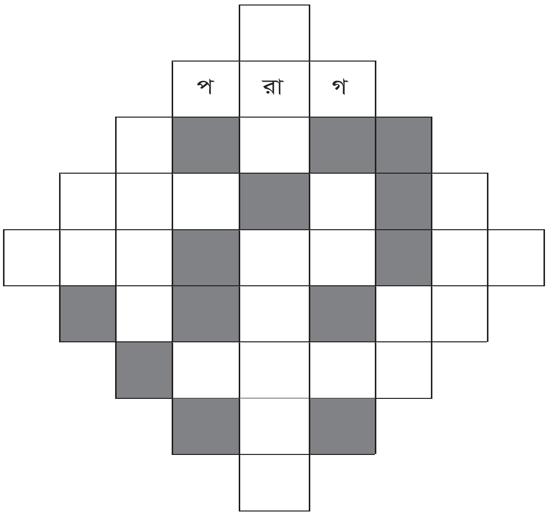

গত সংখ্যার সমাধান

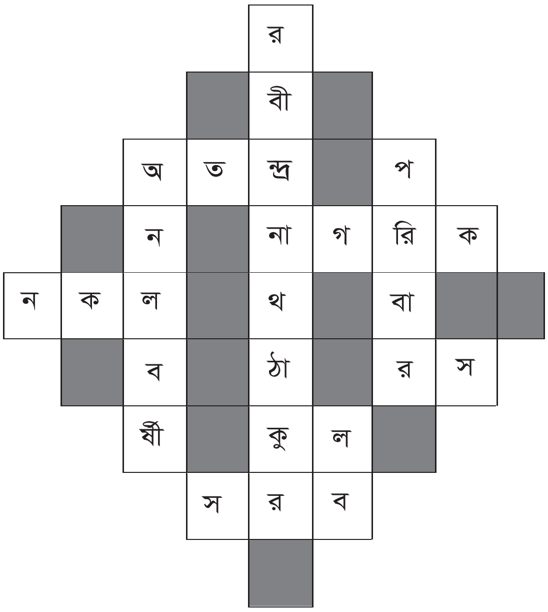

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

১	৪	৫	১৮	১৯	২২	২৩	২৪	২৫
২	৩	৬	১৭	২০	২১	২৮	২৭	২৬
৯	৮	৭	১৬	১৫	৩০	২৯	৩৪	৩৫
১০	১১	১২	১৩	১৪	৩১	৩২	৩৩	৩৬
৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৫০	৪৯	৩৮	৩৭
৬৪	৭৭	৭৮	৭৯	৭০	৫১	৪৮	৩৯	৪০
৬৩	৭৬	৮১	৮০	৭১	৫২	৪৭	৪৬	৪১
৬২	৭৫	৭৪	৭৩	৭২	৫৩	৫৪	৪৫	৪২
৬১	৬০	৫৯	৫৮	৫৭	৫৬	৫৫	৪৪	৪৩

গত সংখ্যার সমাধান

৫		৩	১৮					২৩
	৭			৫২	৫১	৪৪	৪৩	
৯		১						
	১৩		১৫					
১১		৬৭	৬৬			৪৭		
	৭৯			৫৬	৫৭		৩৯	
				৬৩		৩৭		
	৮১		৭১				৩৫	
৭৫		৭৩			৬০	৩৩		৩১

সঠিক উত্তর পাঠিয়ে দাও এই ঠিকানায়

সম্পাদক, নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০।

ইমেইল: editornobarun@dfp.gov.bd